

শ্রীঅনিল চন্দ্র ঘোষ—

"Physical & moral health of a
nation depends on its martial
spirit"—Von Bernhardi.

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্‌,এ-প্রণীত

বীরত্বে বাঙালী

ব্যায়ামে বাঙালী

বিজ্ঞানে বাঙালী

বাংলার ঋষি

বাংলার মনীষী

রাজর্ষি রামমোহন—জীবনী ও রচনা

আচার্য্য জগদীশ—জীবনী ও আবিষ্কার

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—জীবনী ও বাণী

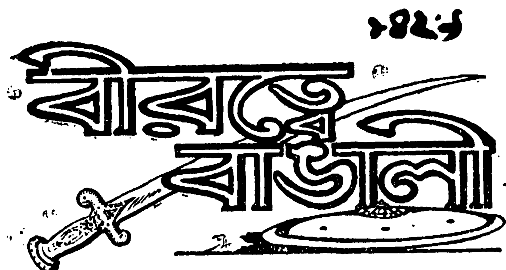
যুগাচার্য্য বিবেকানন্দ—জীবনী ও বাণী

কেনারাম

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ঢাকা

নিউ প্রেসিডেন্সী বুক ডিপো

কলিকাতা : ৬৪নং কলেজ ষ্ট্রীট্



'ব্যায়ামে বাঙালী', 'বিজ্ঞানে বাঙালী', 'বাংলার ঋষি',
'বাংলার মনীষী', 'কেনারাম', 'রাজর্ষি রামমোহন' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম্, এ-প্রণীত

তৃতীয় সংস্করণ—পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত



প্রেসিডেন্সি লাইব্রেরী
ঢাকা

এক টাকা

নিউ প্রেসিডেন্সী বুক ডিপো
৬৪ কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

'বাঘের বাচ্ছারে বাঘ না করিনু যদি
কি শিখানু তা'রে ?'

—রবীন্দ্রনাথ

ঢাকা প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী হইতে শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ঢাকা নবাবপুর, নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে শ্রীরাধাবল্লভ বসাক দ্বারা মুদ্রিত। ১৩৩০

'আবার তোরা মানুষ হ'

"মুক্তবেণীর গঙ্গা যেথায় মুক্তি বিতরে রঙ্গে
আমরা বাঙ্গালী বাস করি সেই তীর্থে বরদ বঙ্গে।
আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে,
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে।
আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়।
এক হাতে মোরা মগেরে রুখেছি, মোগলেরে আর হাতে,
চাঁদ প্রতাপের হুকুমে হঠিতে হয়েছে দিল্লীনাথে।"

—৺সত্যেন্দ্র দত্ত

বাঙ্‌লা শক্তিপীঠ। বাঙালী শক্তির 'চিরকেলে' মোহান্ত। কত যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্‌লার কোমল মাটিতে শক্তির-রুদ্র-সাধনা বীর-সাধক বাঙালী করিয়া আসিয়াছে। রুদ্র-পূজারী বাঙালী তন্ত্রসাধনার স্রষ্টা। বাঙ্‌লার মাটি শক্তিমন্ত্র-পূত, এ মাটির মানুষ খাঁটি বাঙালী প্রত্যেকেই মহাশক্তির আধার। এই শক্তি পুরুষ পরম্পরার অবদান, ইহা হইতে বাঙালীকে কেহ কোনদিন বঞ্চিত করিতে পারিবে না।

ভূমিকা

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙ্গালী কখনও মানুষ হইবে না। যাঁহার মনে থাকে এ বংশ হইতে কখন মানুষের কাজ হয় নাই, তাহা হইতে কখন মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয় বংশে রক্তের দোষ আছে।.....বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের সন্ধান করি।"

নব্য বাঙ্‌লার মাতৃমন্ত্রের আদিগুরু 'বাঙ্‌লার কলঙ্ক' অপনোদনে উদ্যত হইয়া সর্ব্বপ্রথম 'প্রচারে' যে অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন, তাহারই ফলে বিগত কয়েক বৎসর মধ্যে বাঙ্‌লার কতিপয় একনিষ্ঠ সাহিত্য-সেবকের চেষ্টায় বাঙ্‌লার জাতীয় ইতিহাস অনেকটা মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ইঁহাদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ভারতের বীরেন্দ্র-সমাজে অপাংক্তেয় বাঙালী জগতের ইতিহাসেও উচ্চাসনের দাবী করিতে সাহসী হইয়াছে। কিন্তু এই সকল বিতর্কবহুল প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা সাধারণ পাঠকগণের রুচিপ্রদ হয় না এবং উহা সকলের অধিগম্যও নহে। তারপর বাঙ্‌লার বিশ্ববিদ্যালয় ও নিম্নবিদ্যালয় সমূহে বাঙ্‌লার ইতিহাসের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার বাধ্যতামূলক নিয়ম নাই। যাহা-কিছু অধ্যাপনা হইয়া থাকে তাহা আর যাহাই হউক বাঙালীর ইতিহাস নহে। ইহার ফলে আমাদের ছেলেরা অনেকে বিশিষ্ট শিক্ষালাভ করিয়াও জাতীয় ইতিহাসে একেবারে অনভিজ্ঞ থাকিয়া যান।

এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকেরই পঠনোপযোগী ও রুচিপ্রদ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কৃতকার্য্য কতদূর হইয়াছি, সুধীগণ বিবেচনা করিবেন। পুস্তকে খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও কবিগণের অনেক কথাই স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছি। গল্পাকারে লিখিত তরুণপাঠ্য পুস্তক বলিয়া সর্ব্বত্র তাঁহাদের নামোল্লেখ করিবার অবসর পাই নাই। এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ অন্তরে ক্ষমা চাহিতেছি।

নিবেদক

বর্ষা, ১৩৩৪ শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ

সূচীপত্র



বিজয় সেনানী

"আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ লঙ্কা করিয়া জয়।
সিংহল নামে রেখে গেছে নিজ শৌর্য্যের পরিচয়॥"

সে প্রায় আড়াই হাজার বছর আগেকার কথা। যেদিন অহিংসার মূর্ত্ত দেবতা ভারতের বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইলেন, সেইদিন বাঙালীর ভীম রণভেরী সোণার লঙ্কার সিন্ধুসৈকতে বাজিয়া উঠিল।

সেকালে রাঢ় দেশের রাজা ছিলেন মহারাজ সিংহবাহু। বিজয় সিংহ তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র।

মহারাজ সিংহবাহু আদেশ করিয়াছেন, যুবরাজ বিজয়কে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে হইবে। কুমার নাকি রাজ্যের প্রজাদের উৎপীড়ন করেন। বঙ্গরাজের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া রাজপুত্র বিজয় সিংহ দেশ-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইলেন।

তখন তাঁহার সঙ্গী জুটিল সাত শত স্বজাতীয় বাঙালী সহচর।

এই লক্ষ্য-হারা গৃহ-ছাড়া সাত শত বাঙালী প্রকাণ্ড অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া শাদা ধব্‌ধবে পাল উড়াইয়া দাঁড়

টানিয়া ভারত সাগরের বিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মি-বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল—কোন্ অজানা দেশ কোথায় আছে তাহারি সন্ধানে।

দক্ষিণ দিকে চলিতে চলিতে এই সাহসিকের দল যক্ষপুরী লঙ্কায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তীরে উঠিতে পারিলেন না। লঙ্কারাজের সৈন্যদল আসিয়া বাঁধা দিতে আরম্ভ করিল। বিজয় হটিবার লোক নহেন। সাহসে বুক বাঁধিয়া বীরের মত অগণিত সৈন্যের বিরুদ্ধে বিদেশের সৈকতে মাত্র সাত শত বাঙালী সেনা লইয়া যক্ষপুরী লঙ্কা জয়ে আগুয়ান হইলেন।

ওদিকে লঙ্কারাজ নিজেও নিরস্ত রহিলেন না। তিনিও অসংখ্য হাতী, অশ্ব ও পদাতিক সেনা লইয়া রণ-ক্ষেত্রে ছুটিয়া আসিলেন। সে এক বিরাট বাহিনী। মস্ত বড় বড় শ্বেতহস্তী নানা অলঙ্কারে শোভিত – হাওদার চারিদিকে তীক্ষ্ণ শর গোছায় গোছায় সাজানো—তাহার উপর রাজছত্রের তলে লঙ্কার রাজা। সঙ্গে তাহার সব নাম-করা সেনানায়ক। সকলেই সুসজ্জিত রণ-হস্তীর উপর। তাহাদের আশে-পাশে অশ্বারোহী ও পদাতিকের দল। অশ্বারোহীরা অভেদ্য বর্ম্ম-শোভিত, হাতে তাহাদের সুদীর্ঘ বর্শা। পদাতিকের হাতে ঢাল ও বর্শা, অনেকের হাতে আবার উন্মুক্ত তরবারী। এই সুসংহত ও সুসজ্জিত সেনা তীব্র ভাবে বিজয়ের সঙ্গীদের উপর আসিয়া পড়িল।

বিজয়ও অবশ্য প্রস্তুত ছিলেন। প্রথমে জলের উপরই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সাগরের বুকে নাচিতে নাচিতে বিজয়ের জাহাজ খানা ভীষণ বেগে শত্রু-বাহিনীর দিকে অগ্রসর হইল। তীরে

তীরে আকাশ ছাইয়া ফেলিল। মৃত ও আহতের শোণিত-ধারায় সাগরের জল রাঙা হইয়া উঠিল। সে কী ভীষণ যুদ্ধ!

অবশেষে বিজয়-লক্ষ্মী বিজয়ের কোলেই ঢলিয়া পড়িলেন। লঙ্কার সেই জাঁকালো বিশাল সেনাদল মাত্র সাত শত বাঙালীর হাতে বিধ্বস্ত হইল। বাঙালী শক্তির প্রতিষ্ঠা হইল।

লঙ্কা জয় করিয়া বিজয় সিংহ সেখানকার রাজা হইলেন এবং দেশের পুনরায় নামকরণ করিলেন—সিংহল। সেই হইতে সিংহলের ইতিহাসের সূত্রপাত হইল। বিজয়ই সিংহলের ইতিহাসের আদি স্রষ্টা।

রাজা হইয়া বিজয় পাণ্ড্যদেশের রাজকুমারীকে বিবাহ করিলেন। যে জাহাজে চড়িয়া রাজকুমারী আসিয়াছিলেন উহাতে সাত শতেরও অধিক লোক ধরিত।

আমাদের অমর কবি সিংহল-বিজয়ের সে বীরত্ব-গরিমা গাহিয়া বড় আশার বাণী শুনাইয়াছেন—

“একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
তুই কি না মাগো তাদের জননী, তুই তো না মাগো তাদের দেশ!
কিসের দুঃখ কিসের দৈন্য কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ?”

মহারাজ শশাঙ্ক

মহারাজ শশাঙ্ক বাঙ্‌লার ইতিহাসে একটা উল্কার মত আসিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্ব ও শৌর্য্যের প্রভায় বঙ্গ-ভুবন দীপ্ত ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

যে গুপ্তবংশ একদিন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে সমস্ত উত্তর-ভারত শাসন করিয়াছিলেন, শশাঙ্ক ছিলেন সেই রাজবংশেরই মুকুট-মণি। তাঁহার পিতা মহারাজ মহাসেনগুপ্ত নামে-মাত্র বাঙ্‌লা ও মগধের রাজা ছিলেন; তখন গুপ্তবংশের জীর্ণ দশা। রাজা বৃদ্ধ ও শক্তিহীন। চারিদিকের ছোট-বড় রাজ্যগুলি লোলুপ দৃষ্টিতে মহাসেনগুপ্তের রাজ্যটি গ্রাস করিতে অগ্রসর হইয়াছে।

এই অবস্থায় মহাসেনগুপ্তের মৃত্যু হইল। কুমার শশাঙ্ক দেব গৌড়দেশে এক শক্তিশালী রাজ্য গড়িলেন। আমাদের বাঙ্‌লা দেশকেই সেকালে গৌড়দেশ বলিত। আমাদের নাম ছিল তখন গৌড়ীয় বা গৌড়জন।

আমরা এখন যাহাকে বলি বর্দ্ধমান বিভাগ, আগেকার দিনে ইহার নাম ছিল রাঢ় দেশ। এই রাঢ়দেশে মহারাজ শশাঙ্কের রাজধানী ছিল। রাজধানীর নাম ছিল কর্ণসুবর্ণ। মুর্শিদাবাদের বার মাইল দূরে এই কর্ণসুবর্ণ নগর অবস্থিত ছিল। সে ঐশ্বর্য্য-

শালী রাজধানী আজ কোথায় নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে, রহিয়াছে শুধু তার নামটি। কর্ণসুবর্ণের বর্ত্তমান নাম কানসোনা।

কুমার শশাঙ্ক ছোটকালে রাজপরিবারের বৃদ্ধ সৈনিক-ভাটের নিকট বসিয়া বসিয়া তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন। যখন শুনিতেন, তাঁহারই পূর্ব্বপুরুষ সমুদ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত ও স্কন্দগুপ্ত সমগ্র ভারতবর্ষে বীরবিক্রমে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের বীরত্বে দুর্দ্ধর্ষ হূনের দল পরাস্ত ও বিতারিত হইয়াছিল, তখন তাঁহার ছোট্ট বুকটি গর্ব্বে দুলিয়া উঠিত, হৃদয়ে এক অখণ্ড ও বৃহত্তর বঙ্গ-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার দুরন্ত স্বপ্ন জাগিয়া উঠিত। যখন সেই বৃদ্ধ ভাটের ভাঙা গলায় করুণ স্বরে সমুদ্রগুপ্তের রণ-যাত্রা, হূণ আক্রমণের জন্য নাগরিক-দিগকে উত্তেজিত করিয়া রণ-গীতি সুরে-বেসুরে বাজিয়া উঠিত, তখন কুমারের শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের ধারা উদ্দাম হইয়া নাচিয়া উঠিত। শশাঙ্কের দেহটি শুভ্র ও উন্নত ছিল, ঝাক্‌ড়া ঝাক্‌ড়া চুলগুলি তাঁর পিঙ্গল ছিল। এই দীর্ঘায়ত শরীরের ভিতরে এমন একটি মন বাস করিত যাহার দুর্দ্দম স্পৃহা সমস্ত বাঁধাবিঘ্ন ছাপাইয়া ছুটিত।

তখন ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ। স্থাণ্বীশ্বরের (বর্ত্তমান থানেশ্বরের) প্রভাকরবর্দ্ধন মস্ত-বড় পরাক্রমশালী রাজা। তিনি উত্তর-ভারতে এক অখণ্ড সাম্রাজ্য গড়িবার আয়োজন করিতে ছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন ও মধ্যম হর্ষবর্দ্ধনই বিখ্যাত। কন্যা একটি, নাম রাজ্যশ্রী।

এই সময়ে পাঞ্জাবে হুণ নামে এক বর্ব্বর ও দুর্দ্ধর্ষ জাতি মধ্য-এশিয়া হইতে আসিয়া ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। প্রভাকরবর্দ্ধন তখন বৃদ্ধ হইয়াছেন, রাজ্যবর্দ্ধনই সৈন্যসামন্ত লইয়া হুণ আক্রমণে ছুটিলেন। ছোট ভাই হর্ষবর্দ্ধনও একদল অশ্বারোহী সেনা লইয়া দাদার সহযাত্রী হইলেন। তাঁহারা যখন যুদ্ধে ব্যাপৃত, এমন সময়ে সংবাদ পাইলেন বৃদ্ধ মহারাজ প্রভাকরবর্দ্ধন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। হর্ষবর্দ্ধন সংবাদ পাইয়াই থানেশ্বরের অভিমুখে ছুটিলেন, কিন্তু বাবাকে বাঁচাইতে পারিলেন না।

প্রভাকরের মৃত্যুতে শত্রু-দল সুযোগ পাইল। এই সময়ে মালবের রাজা ছিলেন দেবগুপ্ত। তিনি কনৌজ আক্রমণ করিয়া বসিলেন। কনৌজের রাজা গ্রহবর্ম্মা, তিনি রাজ্যশ্রীর স্বামী। যে যুদ্ধ হইল তাহাতে গ্রহবর্ম্মা পরাজিত ও নিহত হইলেন, কনৌজ-রাণী রাজ্যশ্রী শত্রুর কারাগারে বন্দিনী হইলেন।

ভগ্নীপতির পরাজয় ও নিধন সংবাদে রাজ্যবর্দ্ধন কনৌজের দিকে ছুটিলেন এবং মালব-রাজকে আক্রমণ করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ হইল, মালব-রাজ রাজ্যবর্দ্ধনের হাতে পরাজিত হইলেন। এই বিজয়-বার্ত্তা রাজধানীতে পৌঁছিলে রাজধানী জয়-কোলাহলে মুখরিত হইয়া উঠিল, থানেশ্বরের নাগরিকদলের হাসিতে দশদিক্ হাসিয়া উঠিল। সকলেই বুঝিল, রাজ্যবর্দ্ধন বাপেরই যোগ্য ছেলে। এবার কুল পবিত্র হইল, জননী কৃতার্থ হইলেন।

ঠিক এম্‌নি সময়ে হঠাৎ একদিন সংবাদ আসিল 'গৌড়-ভুজঙ্গ' বঙ্গবীর শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করিয়াছেন। অমনি আনন্দ কোলাহল মুহূর্ত্তে কোথায় মিলাইয়া গেল, হাসি অশ্রুতে পরিণত হইল। বৃদ্ধদের অলস আলোচনা অচল হইল, তরুণের দল খেলা-ধূলা ছাড়িয়া দিল, নহবতের সুর অকস্মাৎ নীরব হইল। রাজধানীর এমন বিষাদ-মাখা চেহারা কেহ আর দেখে নাই।

রাষ্ট্রবিপ্লবের এই সন্ধিক্ষণে সুযোগ বুঝিয়া গৌড়াধীশ শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত ও পরাজিত করিয়া কান্যকুব্জ জয় করিয়াছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধন মালব-রাজকে পরাস্ত করিয়া নির্ভাবনায় কান্যকুব্জে বাস করিতেছিলেন। এমন কি সেনাপতি ভণ্ডিকে বেশীর ভাগ সেনাসহ রাজধানীতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সঙ্গে যে সেনা ছিল তাহা গণনায় ছয় সাত হাজারের বেশী নয়। এই মস্ত সুযোগেই বিচক্ষণ গৌড়াধীশ কান্যকুব্জ আক্রমণ করেন এবং সহজেই উহা দখল করিয়া লন।

কান্যকুব্জ জয় করিয়া মহারাজ শশাঙ্ক, গুপ্ত নামক এক প্রতিনিধির হাতে উহার শাসন-ভার অর্পণ করিয়া আসেন এবং বন্দিনী রাজ্যশ্রীকে মুক্ত করিয়া দেন। ইহা সে-যুগের বাঙালীর নারী-মর্য্যাদার শ্রেষ্ঠ পরিচয়।

এইরূপে মহারাজ শশাঙ্কের বীরত্বে ও বিচক্ষণতায় গৌড়রাজ্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। শশাঙ্ক বাঙালীর জীবনে এক নূতন প্রেরণা আনিলেন। যখন তিনি তাঁর শুভ্রোন্নত দেহখানি লইয়া সেনাদের সম্মুখে দাঁড়াইতেন, মাথার সেই ঝাক্‌রা ঝাক্‌রা

পিঙ্গল কেশগুলি মৃদুবায়ে হিল্লোলিত হইত, বাঙালী সেনাদের প্রাণে এক নূতন উৎসাহ খেলিয়া যাইত। মহারাজ শশাঙ্কের বীরত্ব-প্রভাবে উত্তরে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সামাজ্য বিস্তৃত হইল। দক্ষিণে 'দেবরক্ষিত' তাম্রলিপ্তে মহারাজ শশাঙ্কের জয়ধ্বজা উড়িল, গঞ্জাম পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ অধিকৃত হইল। বাঙালী সৈনিকের হৃদয়-শোণিতের বিনিময়ে এ সামাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এ রক্ত-দান বাঙালীর গৌরবের কথা। বাঙালীর বাহুবল ও শাসনক্ষমতায় বিশ্ব-ভারত বিস্মিত হইয়াছিল, বাঙালী সেনার পদ-ভরে ভারত-মেদিনী কম্পিত হইয়া উঠিয়াছিল। একথা মনে হইলেও গর্ব্বে আমাদের বুক ফুলিয়া উঠে, মাথাটা আপনি উঁচু হয়।

রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন রাজা হইলেন। রাজা হইয়া তিনি আদেশ করিলেন, গৌড়ীয় নৃপতির সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। প্রতিজ্ঞা করিলেন, ভ্রাতৃহন্তার শাস্তি বিধান না করিয়া জলস্পর্শ করিবেন না। দেখিতে দেখিতে পাঁচ হাজার রণহস্তী, বিশ হাজার অশ্বারোহী, পঞ্চাশ হাজার পদাতিক গৌড়-সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত হইল।

এদিকে বাঙলায় সাজ সাজ রব পড়িয়া গিয়াছে। বাঙালী যুবকদল দলে দলে লড়াইয়ের নেশায় মাতোয়ারা হইয়া মহারাজ শশাঙ্কের পতাকাতলে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। কৃষক লাঙ্গল ফেলিয়া আসিল, মজুর বোঝা নামাইয়া আসিল, শিল্পী শিল্প ছাড়িয়া আসিল, পড়ুয়া পুঁথি ফেলিয়া আসিল। বাঙালীর কোষের অসি

ঝনৎকার করিল, হাতের বর্শা ঝল্‌সিয়া উঠিল, মাথায় রাঙা শিরোপা পড়িয়া বাঙালী রণস্থলে ধাবিত হইল।

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কাটিয়া গেল। বাঙালীর মাথার শিরস্ত্রাণ খসিল না, হাতের অসি কোষবদ্ধ হইল না। হর্ষবর্দ্ধনের বাঙ্‌লা জয়ও হইতে পারিল না। মহারাজ শশাঙ্কের জীবিতাবস্থায় বাঙালীর শূরত্বের লাঘব কিছুমাত্র হইল না।

সমর-ক্লান্তি দূর করিতে না করিতেই দুষ্ট ব্রণ আসিয়া মহারাজ শশাঙ্কের দেহ ধ্বংস করিয়া দিল। বাঙ্‌লার আকাশ আঁধার করিয়া গৌড়-শশাঙ্ক অস্তমিত হইলেন। "বাঙ্গালীর বীরত্ব-গাঁথা বাণের মুখে, অসির ফলকে উত্তর-ভারতে উৎকীর্ণ রহিল।"

কাশ্মীরে বাঙালী বীর

অষ্টম শতাব্দী সবে মাত্র স্থরু হইয়াছে। কাশ্মীরের রাজা ছিলেন তখন ললিতাদিত্য। ললিতাদিত্য একজন মস্ত-বড় প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে সমস্ত দেশটা এক সময়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল।

থানেশ্বরের মহারাজ হর্ষবর্দ্ধনের যে সাম্রাজ্য ছিল, উপযুক্ত পরিচালনার অভাবে তাহা তখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ছোট ছোট কতকগুলি রাজ্য সমস্ত উত্তর-ভারত ছাইয়া ফেলিয়াছে। ইহাদের মধ্যে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মা একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন।

কিন্তু যখন কাশ্মীর-রাজ ললিতাদিত্য কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন, তখন মহারাজ যশোবর্ম্মার রাজ্য-রক্ষা দুষ্কর হইয়া পড়িল। ললিতাদিত্যের দুর্দ্ধর্ষ পার্ব্বত্য সেনাদলের নিকট সমতলবাসী কনৌজিয়ারা কিছুতেই আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। যশোবর্ম্মা পরাজিত ও বিতাড়িত হইলেন।

কনৌজ জয় করিয়াই ললিতাদিত্য বিজয়ী সেনাদল লইয়া বাঙ্লার দিকে ছুটিলেন। গৌড়রাজ, কাশ্মীর-পতির সহিত হৃদ্যতা স্থাপন মানসে বহু হাতী উপঢৌকন পাঠাইয়া সন্ধির প্রস্তাব

করিলেন। ললিতাদিত্য তাহাতে স্বীকৃত হইলেন, যদিও মনের ভাবটা তাঁহার অন্যরকম ছিল।

তিনি ইহার কিছু পরেই গৌড়-রাজকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। বলিলেন, ভগবান্ পরিহাস-কেশব বিগ্রহের সাক্ষাতে শপথ করিতেছি, আপনার অমর্য্যাদা করিব না। অতিথি আপনি, আপনার অঙ্গস্পর্শ করিব না।

ভগবানের নামে শপথ, ইহার উপর আর কথা চলে না। গৌড়রাজ অসন্দিগ্ধ চিত্তে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু ললিতাদিত্য এ প্রতিজ্ঞা রাখিলেন না। নির্ভীক ও সত্য-সন্ধ গৌড়-রাজকে ত্রিগামী নামে এক জায়গায় গুপ্ত ঘাতক নিযুক্ত করিয়া হত্যা করাইলেন।

যখন এই বিষাদ-কাহিনী বাঙ্লায় পৌঁছিল, সমগ্র গৌড়-দেশ প্রতিশোধের তীব্রানলে জ্বলিয়া উঠিল। সেই সময়ে গৌড়পতির জনকয়েক বাঙালী অনুচর যেরূপ অসম সাহসে কাশ্মীর-বাহিনীর সহিত ভীষণ যুদ্ধে ক্ষাত্রবীর্য্যের পরিচয় দিয়া আত্মবলিদান করিয়াছিলেন, তাহা জগতের ইতিহাসে বিরল।

গৌড়-রাজের এই অনুচর কয়জন প্রতিশোধের আগুনে জ্বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, কাশ্মীর-পতিকে উচিত শিক্ষা দিয়া ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। আমরা দেখাইব, বাঙালীর শ্যাম ভুজে কত বল ধরে। কিন্তু যোদ্ধবেশে গেলে তো চলিবে না। তখন তাঁহারা তীর্থযাত্রীর বেশ ধরিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে

বলিতেন, আমরা পুণ্যপীঠ সারদামন্দির দেখিতে যাইতেছি। সারদামন্দির কাশ্মীরের নাম-করা তীর্থস্থান।

তখন কাশ্মীর-রাজ দেশান্তরে ছিলেন। গৌড় বীরগণ রাজার সাক্ষাৎ না পাইয়া সেই সাক্ষীদেব পরিহাস-কেশবের মন্দির বেষ্টন করিলেন। এই বিগ্রহের সাম্নেই ললিতাদিত্য শপথ করিয়াছিলেন। তীর্থযাত্রীর বেশ মুহূর্ত্তে ফেলিয়া দিয়া সেই গৌড়ীয়গণ শাণিত অসি হাতে মন্দিরের দিকে ছুটিলেন। তাঁহাদিগকে মন্দিরে ঢুকিতে দেখিয়া পূজারীগণ মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

কিন্তু বঙ্গবীরগণ এক ভুল করিলেন। তাঁহারা পরিহাস-কেশবের মন্দির ভাবিয়া রামস্বামীর মন্দির আক্রমণ করিয়া বসিলেন। রামস্বামীর মূর্ত্তি রূপার তৈরী। বীরগণ এই বৃহৎ বিগ্রহটি ভাঙিয়া রেণুরূপে পরিণত করিলেন এবং তিল তিল করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলিলেন।

সংবাদ যখন রাজধানীতে পৌঁছিল, দলে দলে সেনা আসিয়া বঙ্গবীরদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। বঙ্গবীরগণ তখন মোরিয়া হইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা মরণকে নিশ্চিত জানিয়াই আসিয়াছিলেন। কাশ্মীরের সেই বিশাল সেনাদলের উপর তাই অনায়াসে অসিহস্তে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিয়াছিলেন। একে একে বঙ্গীয় বীরগণ যুদ্ধ করিয়া সমর-শয্যায় পড়িতে লাগিলেন। তাঁহাদের শ্যামবর্ণ দেহগুলি রক্তে রাঙা হইয়া এক অপরূপ শোভা ধারণ করিল। বীরগণ প্রাণ দিলেন, হৃদয়ের রক্ত দিলেন, জাতির

মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। এমনি করিয়াই সেদিনকার বাঙালী জীবন-পথে আগুয়ান হইতেন।

এই স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করিয়া কাশ্মীরের ঐতিহাসিক কহ্লন পণ্ডিত লিখিয়াছেন—

"দীর্ঘকাল লঙ্ঘনীয় গৌড় হইতে কাশ্মীরের কথাই বা কি বলিব এবং মৃতপ্রভুর প্রতি ভক্তির কথাই বা কি বলিব? গৌড়ীয়গণ তখন যাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন বিধাতার পক্ষেও তাহা সম্পাদন করা অসাধ্য। আজও রামস্বামীর মন্দির শূন্য দেখা যায়। সেই গৌড়বীরগণের যশে ব্রহ্মাণ্ড পরিপূর্ণ রহিয়াছে।"

ইহা শত্রুপক্ষের ঐতিহাসিকের উক্তি। ইহা হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি সেকালের বাঙালীর সহিত আমাদের পার্থক্য কতখানি। যখন যাতায়াতের আধুনিক সুবিধার কিছুই ছিল না, সেই বিপদসঙ্কুল যুগে বাঙ্লা হইতে কাশ্মীরের সুদীর্ঘ পথে চলিয়া মুষ্টিমেয় বাঙালী বুকে প্রতিশোধের তুষানল চাপিয়া এমন মোরিয়া হইয়া জীবন দান করিয়া বাঙালীর অক্ষয়কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ন্যায্য ক্রোধের আগুণ যখন নিভিয়া যায়, জাতির জীবনও তখন নুইয়া পড়ে। জ্যান্ত জাতির সবুজ প্রাণই প্রতিশোধের বিচরণ-ভূমি। পাথরকে পদাঘাত করিলে পাথর বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠও দেখায় না, গরুকে ভর্ৎসনা করিলেও সে নীরবেই ঘাসজল খায়। অত্যাচারীর দণ্ড-বিধানই ক্ষাত্র-ধর্ম্ম, বীর ধর্ম্ম।

তাই বীরনারী বিদুলা শত্রু কর্তৃক নির্জ্জিত অথচ প্রতিকারে উদাসীন নিরুদ্যম পুত্রকে ভর্ৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন—

উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা স্বাপ্সীঃ শত্রুনির্জ্জিতঃ।
ক্ষমাবান্নিরমর্ষশ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্॥

হে কাপুরুষ, শত্রু-নির্জ্জিত হইয়া আর শয়নে থাকিওনা, উঠ, যে নিয়ত ক্ষমাশীল, নির্জ্জিত হইয়াও যে ক্রুদ্ধ হয় না, সে স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয় (অর্থাৎ ক্লীব)। বরং মুহূর্ত্ত মাত্র জ্বলিয়া উঠিয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হও, সেও ভাল ; তবু চিরকাল অবসাদ-ধূমে আচ্ছন্ন থাকিও না—'মুহূর্ত্তং জ্বলিতং শ্রেয়ঃ নতু ধূমায়িতং চিরম্।'

সম্রাট্ ধর্ম্মপাল

অষ্টম শতাব্দীর বাঙ্লা 'সহস্ররাজক'। দেশকে খণ্ড খণ্ড ভাগ করিয়া বহু ছোট ছোট রাজা রাজত্ব করিতেন। যখন বাঙ্লার এইরূপ অবস্থা তখন দেশকে সংহত ও শক্তিশালী করিবার জন্য সমস্ত বঙ্গীয়গণ সম্মিলিত হইলেন। সেই সম্মিলিত গৌড়বাসী নিজেদের মধ্য হইতে রাজ-নির্ব্বাচন করিয়া যাঁহার শিরে গৌড়বঙ্গের কনক-কিরীট স্থাপন পূর্ব্বক মহোল্লাসে জয়নিনাদ করিয়া উঠিলেন—তিনিই অশেষ গুণসম্পন্ন বঙ্গেশ্বর গোপাল।

মহারাজ গোপালের অধিনেতৃত্বে বিচ্ছিন্ন বঙ্গ সংহত হইল। বাঙালী জাতি মহাদুর্দ্ধর্ষ হইয়া দাঁড়াইল,—শৌর্য্যে-বীর্য্যে বাঙালী তখন অতুল। বাঙ্লার বিজয়-বৈজয়ন্তী মিথিলা ও মগধে উড্ডীন হইল। দেশময় নির্ব্বাচিত নবভূপতির জয়-জয়কার পড়িয়া গেল।

"গোপালদেবের বিজয় লাভ দেখিয়া মনে হয়, বঙ্গে কোন দিনই শক্তির অভাব ছিল না – বাঙ্গালীর সাহসের অভাব ছিল না। অভাব ছিল উপযুক্ত নায়কের।"

গৌড়মণ্ডল একচ্ছত্র করিয়া গোপালদেব স্বর্গারোহণ করিলে তাঁহার যোগ্যপুত্র ধর্ম্মপাল রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। মহারাজ শশাঙ্কের ভারতব্যাপী বঙ্গসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মহাব্রত

মহারাজ ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক উদ্‌যাপিত হইল। তাঁহার প্রতি কার্য্যে, প্রতি চিন্তায় এক লক্ষ্য ছিল—বাঙ্‌লাকে সমস্ত ভারতে ছড়াইয়া দিয়া এক বৃহত্তর বাঙ্‌লা গড়িয়া তোলা। ইহাই ছিল তাঁহার জীবন-সাধনা।

মহারাজ গোপালদেবের সময়ে বঙ্গ গৌড় ও মগধের সামন্ত-রাজগণই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু মগধের বাহিরে বাঙালী সেনার বিজয়-নিশান এ পর্য্যন্ত উড্ডীন হয় নাই। মহারাজ ধর্ম্মপালদেবের অধিকার কালে উত্তর-ভারত জয়ের এক মস্ত সুযোগ উপস্থিত হইল। এই সময়ে কান্যকুব্জের ন্যায্য অধিকারী চক্রায়ুধ খুল্লতাত ইন্দ্রায়ুধ কর্ত্তৃক স্বরাজ্য হইতে বঞ্চিত ও বিতাড়িত হইয়া গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের শরণাপন্ন হন।

ধর্ম্মপালদেব শরণাগত চক্রায়ুধকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সমস্ত সামন্তরাজগণকে আহ্বান করিয়া যুদ্ধোদ্যমের কথা বলিলেন। সামন্তরাজগণ স্ব স্ব সেনাদল লইয়া আসিলেন। দলে দলে বাঙালী যুবকবৃন্দ সেনাদলভুক্ত হইতে লাগিল। বাঙ্‌লা দেশ জুড়িয়া রণ-অভিযানের সাড়া পড়িয়া গেল। রাজধানীতে প্রবল উত্তেজনা ও কর্ম্মশীলতা সমস্ত নাগরিকদিগের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। সকলের মুখেই এক কথা, মনে এক চিন্তা। যাহার সঙ্গে যাহার দেখা হইতেছে, প্রত্যেকেই সোৎসুক ভাবে এই নব-অভিযানের কথা আলোচনা করিতেছে।

একদিন এই বিশাল গৌড়ীয় সেনাবাহিনী গৌড়েশ্বরের জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস কাঁপাইয়া উত্তরাপথে বিজয়-যাত্রা

করিল। সমস্ত সামন্ত সেনাপতি সহ স্বয়ং গৌড়রাজ ধর্ম্মপালদেব চক্রায়ুধকে সঙ্গে লইয়া এই বিজয়-বাহিনীর সহগামী হইলেন। রাজধানীতে মহারাজের কনিষ্ঠ ভাই বাক্‌পাল নূতন সৈন্য সংগ্রহের জন্য, ও বিচক্ষণ মন্ত্রী গর্গদেব রাজ্যরক্ষার্থ রহিলেন।

এদিকে গৌড়ীয় সেনা মগধের সীমা অতিক্রম করিয়া বারাণসী-ভুক্তিতে উপস্থিত হইল। বারাণসীর পরপারে আসিয়া দেখিল, কান্যকুব্জরাজের আদেশে অধিকাংশ নৌকা দগ্ধ হইয়াছে। যে কয়খানি জুটিল তাহাতে অল্পে অল্পে গৌড়ীয় সেনা নদী পার হইল।

অপর পারে যাইয়া গৌড়ীয়গণ কাশীর প্রাকার আক্রমণ করিল। দুর্গের উপর হইতে অনবরত "মুষল ধারে শিলা ও অগ্নিবৃষ্টি হইতেছিল, কটাহ কটাহ উত্তপ্ত তৈল ও গলিত সীসক দুর্গ প্রাকার হইতে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাপি প্রাচীরে শত শত অবরোহণী লগ্ন হইল। নক্ষত্রবেগে গৌড়ীয় সেনা বারাণসীর প্রাচীরে আরোহণ করিল, অপরিমিত লোকসংখ্যা সত্ত্বেও কান্যকুব্জের সেনা হঠিতে লাগিল।"

বারাণসী জয় করিয়াই সেই "ক্লান্ত, শীতার্ত্ত, সিক্ত, অনশনক্লিষ্ট" গৌড়ীয় সেনা প্রয়াগ ও কান্যকুব্জ অভিমুখে ধাবিত হইল। কান্যকুব্জরাজ বারাণসীর পতন সংবাদ শুনিয়াই রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া গুর্জ্জর-রাজ নাগভট্টের রাজধানী ভিল্লমালে শরণ লইলেন। বিনাযুদ্ধে কান্যকুব্জ অধিকৃত হইল, কান্যকুব্জের সামন্তরাজগণ চক্রায়ুধকে রাজধানীতে সাদরে আহ্বান করিয়া লইলেন।

গৌড়রাজ চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জে প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্বদেশে ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ সংবাদ আসিল নাগভট্ট কান্যকুব্জ আক্রমণ করিয়াছেন। দলে দলে পতঙ্গ পালের মত গুর্জ্জর সেনা সমস্ত দেশ ছাইয়া ফেলিল। চক্রায়ুধ পরাজিত হইলেন, গৌড়রাজ সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার উপায় না পাইয়া ধীরে ধীরে মগধের পথে ফিরিলেন। তারপর রাষ্ট্রকূট-রাজের সহিত সৌহার্দ্দ্য স্থাপন করিয়া উভয় শক্তি মিলিত হইয়া গুর্জ্জর রাজকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। গুর্জ্জর-রাজ পরাজিত হইয়া মরুভূমিতে আশ্রয় লইলেন। নাগভট্ট সমস্ত গুর্জ্জররাজ্যগুলির উপর আধিপত্য করিতেন। তাঁহার পরাজয়ে রাজপুতনা ও পঞ্জাবের গুর্জ্জর সামন্তরাজগণ সকলেই ধর্ম্মপালদেবের আশ্রয়ে আসিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ রাজকুমারী রণ্ণাদেবীকে ধর্ম্মপালদেবের সহিত বিবাহ দিয়া আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন। ইহার পর আর কোন দিন গুর্জ্জরগণ বঙ্গ সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে দুঃসাহস করে নাই। গৌড়ীয় সেনা গুর্জ্জরের নিকট 'দুর্ব্বার-বৈরী' বলিয়াই পরিচিত ছিল।

বীরবর চক্রায়ুধ কান্যকুব্জের অধিকার পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গ-সাম্রাজ্যের একজন সামন্তরাজা হইয়া রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

এইরূপে ধর্ম্মপালদেব একে একে ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীর প্রভৃতি রাজ্য অধিকার করিলেন। বর্ত্তমান আফগানিস্থান পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইল।

ধর্ম্মপালদেবের মৃত্যুর পর দেবপাল দেব পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তখন পাল-সাম্রাজ্য উত্তরে কেদারতীর্থ হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুবিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর দেবপাল প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রদীপ্ত উৎসাহ লইয়া ভারত-জোরা সাম্রাজ্যের আরও বিস্তার করিয়া সুদৃঢ় করিয়া তুলিলেন; তাঁহার অধিনেতৃত্বে বঙ্গসেনার হুঙ্কারে 'উৎকল উৎকীলিত' হইল, হুনগর্ব্ব খর্ব্ব হইল, দ্রবিড়-গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণ হইল। উৎকল-রাজ পরাজিত হইয়া রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। পূর্ব্বাঞ্চলে আসাম-রাজও তাঁহার নিকট পরাজিত হইলেন। এইরূপে পূর্ব্ব সমুদ্র ও পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ বঙ্গ-সম্রাট্‌কে করপ্রদান করিতে বাধ্য হইল।

সমগ্র ভারতবর্ষের সম্রাট্‌রূপে গৌড়রাজ দেবপাল দেব পূজিত হইলেন।

কৈবর্ত্তরাজ দিব্য ও ভীম

তখন গৌড়ে দ্বিতীয় মহীপাল রাজা। এই সময়ে বাংলা দেশে বৌদ্ধ-ধর্ম্মের বড় প্রভাব। উহাই ছিল তখন রাজধর্ম্ম। বৌদ্ধগণ মৎস্যভোজী কৈবর্ত্তদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিত, এবং তাহাদিগকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের গণ্ডীর বাহিরে থাকিতে হইত। গৌড়দেশে সকলেই মাছ খাইত, অথচ যত সব বিধি-নিষেধের ডোর এই কৈবর্ত্তজাতির জন্যই যেন সৃষ্ট হইয়াছিল। উত্তর বঙ্গে তখন কৈবর্ত্ত জাতি সংখ্যায় নেহাৎ কম ছিল না, আর ইহাদের হাতেই সেকালে বাঙ্‌লার সমস্ত নৌবহর ও জলপথগুলি ছিল। কারণ অধিকাংশ নৌকা ও নাবিক ছিল কৈবর্ত্ত সমাজের। কাজেই কৈবর্ত্ত জাতির ক্ষমতাও তখন যথেষ্ট। যখন কৈবর্ত্তগণ দেখিল, রাজদ্বারে তাহাদের সম্মান-প্রতিপত্তি নাই, রাজকীয় ধর্ম্মে তাহাদের অধিকার নাই, অথচ তাহারাই দেশের বড় শক্তি, তখন তাহারা বিচলিত ও উত্তেজিত হইয়া উঠিল। কৈবর্ত্ত-পতি দিব্য এই বিক্ষুব্ধ জনসঙ্ঘের নায়ক হইয়া বিদ্রোহীর রক্ত-পতাকা উড্ডীন করিলেন। মহীপাল, কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য চতুরঙ্গ সেনা লইয়া কৈবর্ত্ত-পতিকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু সে

ভীষণ যুদ্ধে নিজেই পরাজিত হইয়া অবশেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। এইরূপে প্রজা-সাধারণের প্রতিভূ কৈবর্ত্ত-রাজ দিব্য স্বাধীন কৈবর্ত্ত-রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দিব্যের পর তাহার ভ্রাতা রুদোকের পুত্র ভীম বরেন্দ্রভূমির (উত্তর বঙ্গ) রাজা হইলেন। বরেন্দ্র হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগ কিছু কালের জন্য কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমের পদানত হইল।

দ্বিতীয় মহীপালের পরে দ্বিতীয় শূরপাল কিছু দিনের জন্য রাজা হইলেন। তিনিও কৈবর্ত্ত-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও নিহত হন।

কৈবর্ত্ত-রাজ ভীম নিজের রাজ্য সুদৃঢ় করিতে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার রাজধানীর নিকটে যাহাতে শত্রুর আক্রমণ হইতে লোক রক্ষা করা যায় সেই জন্য প্রকাণ্ড মৃণ্ময় প্রাচীর নির্ম্মিত করিলেন। প্রায় আট শত বৎসরের নানাপ্রকার অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া সে প্রাচীর এখনও বিদেশীয়দিগের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। জনৈক ইংরাজ ঐতিহাসিক বগুড়া জেলার অন্তর্গত ভীমের রাজধানীর এই প্রাচীর দেখিয়া লিখিয়াছেন—"এই স্থান ইতালীর গোল দুর্গের মত, কেবল নিকটবর্ত্তী সহরবাসী বলিয়া নহে, যাহাতে রাজ্যের চারিদিকের অধিবাসীরা আপৎকালে আশ্রয় লাভ করিতে পারে, এই অভিপ্রায়েই এই সুবিশাল মৃৎপ্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছিল।" ভীম কেবল রাজধানী রক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তিনি নিজের রাজ্য রক্ষারও উপায় করিয়াছিলেন। তিনি বরেন্দ্র ভূমির

পশ্চিম সীমা পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ হইতে রাজ্যের উত্তর সীমা ধুবরী পর্য্যন্ত এক প্রকাণ্ড জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা এখনও 'ভীমের জাঙ্গাল' বলিয়া পরিচিত।

ভীমের যোগ্যতার কথা তাহার শত্রুকবির মুখেও না ফুটিয়া পারে নাই। রামপালের কবিবর সন্ধ্যাকর নন্দী লিখিতেছেন—

"বহুতর রত্নরাজির আশ্রয়ে সরস্বতী ও স্বয়ং লক্ষ্মী যাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সঙ্গে পরাজিত শত্রুলব্ধ শ্রেষ্ঠ অশ্ব, হস্তী ও বীরগণ পর্য্যন্ত তাঁহার অধীন হইয়াছিল। যে রাজাকে পাইয়া বিশ্ব অতিশয় সম্পদ্ লাভ করেন, সজ্জনগণও তাঁহার অযাচিত দানে কল্যাণভূমি লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহার কল্পতরুর ন্যায় স্বভাবের গুণে যাচকগণ অবিরত অস্খলিতপদে জগতে বাস করিয়াছিল। সর্পালঙ্কৃত স্বয়ং চন্দ্রশেখর মহাদেব ভবানীর সহিত যাঁহার পাপ বিদূরিত করিয়া বিরাজিত ছিলেন। যে (ভীম) অতিশয় কীর্ত্তিদ্বারা উদ্দীপ্ত হইয়া দিগ্মণ্ডলের মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মমার্গে উৎসাহিত হইয়া মহাশয় পদবী লাভ করিয়াছিলেন।"

দ্বিতীয় মহীপালের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামপাল এই সময়ে পিতৃরাজ্য উদ্ধারে ব্রতী হন; কিন্তু ভীমের ন্যায় এরূপ প্রজাপ্রিয়, বুদ্ধিমান্ ও শক্তিশালী নরপতিকে পরাজয় করা সহজসাধ্য ছিল না। এই উদ্দেশ্যে রামপাল ও তাঁহার পুত্র রাজ্যপাল সমস্ত দেশময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া মিত্র ও সামন্ত রাজাদিগকে হস্তগত করিতে লাগিলেন। প্রজাসাধারণকে নানাভাবে বুঝাইয়া আপনার পক্ষে

আনিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু আয়াস ও পরিশ্রম করিয়া সামন্ত ও মিত্র রাজাদিগকে হাত করিলেন। প্রায় বিশ জন মিত্র ও সামন্ত রাজাসহ রামপাল কৈবর্ত্ত-পতি ভীমের রাজ্য অধিকার করিতে প্রস্তুত হইলেন। বাঙ্‌লা, মগধ ও রাষ্ট্রকূটের শক্তি সমূহ ভীম-রাজকে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইলেন।

প্রথমে রামপাল মহাপ্রতীহার (সেকালের City Superintendent) শিবরাজকে বরেন্দ্রভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। শিবরাজ ভীমের রাজ্যের তেমন কিছু করিতে পারিলেন না, তিনি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিলেন।

অতঃপর রামপাল স্বয়ং সমস্ত সৈন্য এবং মিত্র ও সামন্ত রাজগণ সহ ভীমের রাজ্য আক্রমণ করিতে অভিযান করিলেন। গঙ্গা পার হইয়া ভীমের রাজ্য আক্রমণ করিতে হইবে। কিন্তু সমস্ত জলপথ কৈবর্ত্ত-পতির অধিকৃত ও রক্ষিত। অবশেষে সঙ্গোপনে নৌ-সেতু প্রস্তুত করিয়া অতি সন্তর্পণে রামপাল বরেন্দ্র ভূমিতে উপনীত হইলেন। রামপালের সেনায় বরেন্দ্র ভূমি আচ্ছন্ন হইল। কৈবর্ত্তরাজ ভীমও নিশ্চিন্ত ছিলেন না, তিনিও সসৈন্যে রণাঙ্গনে উপস্থিত হইলেন। ভীম বিক্রমে যুদ্ধ হইল, তেমন যুদ্ধ উত্তর বঙ্গে কোন দিন হয় নাই। যুদ্ধ করিতে করিতে কৈবর্ত্তপতি শত্রু হস্তে পতিত হইয়া বন্দী হইলেন।

কৈবর্ত্তপতি বন্দী হইলে তাহার অন্যতম সেনানায়ক ও প্রিয়সুহৃদ হরি, বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলকে কৌশলে হঠাৎ সংহত করিয়া প্রবল বেগে ঝড়ের মত রামপালের সেনাদল আক্রমণ করিলেন।

এই অতর্কিত আক্রমণে পাল-সেনা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। রামপালের পুত্র রাজ্যপাল রণক্ষেত্রে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু রামপাল দেবের বিপুল বাহিনীর প্রবল আক্রমণে অল্প সংখ্যক কৈবর্ত্ত-সেনা আর পারিয়া উঠিল না, সেনানায়ক হরি পরাজিত হইলেন। অবশেষে বন্দী হইয়া কৈবর্ত্ত-রাজ ভীমের সহিত নিহত হইলেন।

মহারাজ আদিশূর

পূর্ব্বে গৌড়ের পালরাজগণের শৌর্য্যবীর্য্যের কথা বলিয়াছি। তাঁহারা সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তারপর শূরবংশীয় হিন্দু রাজগণ রাজত্ব লাভ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে আদিশূরের নাম অতি প্রসিদ্ধ।

মহারাজ আদিশূর বিজয়ী বীর ছিলেন। তাঁহার পরাক্রমে উত্তর ভারতে বাঙালীর ভুজবল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আদি-শূরের বিজয়-ধ্বজা সেকালের নাম-করা যোদ্ধা জাতির বাসভূমি কামরূপে উড্ডীন হইয়াছিল। অঙ্গদেশ ও কলিঙ্গদেশ তাঁহার পদানত ছিল। কর্ণাট, মগধ, মালব, জাহ্নব প্রভৃতি দেশের নৃপতিগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ইঁহারা সকলেই মহারাজ আদিশূরের সামন্ত রাজরূপে পরিগণিত ছিলেন।

মহারাজ আদিশূর এক যজ্ঞ করেন। সে প্রায় হাজার বছর আগেকার কথা। সে সময়ে এ দেশে বৌদ্ধ প্রভাব খুব বেশী। দেশের লোক এক রকম সকলেই বৌদ্ধ হইয়া গিয়াছে। ভাল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত দেশে বড় একটা মিলিত না। মহারাজ মহা মুস্কিলে পড়িলেন।

মহারাজ আদিশূরের বলভদ্র নামে এক বিচক্ষণ মন্ত্রী

ছিলেন। বীরবাহু তাঁহার পরাক্রান্ত সেনাপতি। তাঁহারা তখন বলিলেন, মহারাজ, কান্যকুব্জে এখনও বেদজ্ঞ নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মণ আছে। কনৌজ-রাজ বীরসিংহের নিকট দূত পাঠান।

ব্রাহ্মণের জন্য কনৌজে দূত পাঠান হইল। এ প্রস্তাবে কনৌজ-রাজ রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। সভাস্থ সকলে দূতকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন। কনৌজ-রাজ পঞ্চগৌড়পতি মহারাজ আদিশূরকে লিখিলেন,—"শ্রীযুক্ত আদিশূরের স্বস্তি হউক। শ্রীমন্ বীর মহীপতে, যদি তোমার যুদ্ধবাসনা থাকে, সসৈন্যে চলিয়া আইস। যে রাজ্যে ব্রাহ্মণ নাই, যেখানে বেদ পাঠ হয় না, সে দেশ কি কখনও কনৌজবাসীর নিকট মান্য হইতে পারে? যে দেশে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় সেখানে কনৌজের ব্রাহ্মণ যাইতে পারে না।"

বঙ্গ-দূত কনৌজ-রাজকে যথারীতি অভিবাদন করিয়া বিদায় হইয়া মহারাজ আদিশূরকে কনৌজ-রাজের পত্র নিবেদন করিল। পত্র পড়িয়া আদিশূর রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন, তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন যুদ্ধ করিতে হইবে। সৈন্যদলে ধূম পড়িয়া গেল। সামন্ত রাজগণ যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে সুচতুর এক সেনাপতি মহারাজ আদিশূরকে বলিলেন—মহারাজ, কনৌজরাজকে জয় করিতে এত আয়োজনে প্রয়োজন কি? এক কাজ করুন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ আনিয়া বলদের উপর চড়াইয়া কনৌজে পাঠাইয়া দিন। গো-ব্রাহ্মণ দেখিলে কনৌজরাজ তাহাদের উপর আর অস্ত্রক্ষেপ করিতে পারিবেন না!

আমাদেরও কাজ অনায়াসে হাসিল হইবে। এই যুক্তিতে আদিশূর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। সেনাপতি, সাত শত লোককে ব্রাহ্মণবেশে ধনুর্ব্বাণে সজ্জিত করিয়া বৃষে আরোহণ করাইয়া কনৌজ অভিযানে যাত্রা করিলেন।

এই সাত শত বৃষারূঢ় ব্রাহ্মণ-বেশী সৈন্য কনৌজরাজের রাজ্য ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিয়া ছাড়খার করিতে লাগিলেন। কনৌজরাজ বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। গো-ব্রাহ্মণ হত্যাও করিতে পারেন না, অথচ শত্রু নাশ না করিলেও নয়। কাজেই তিনি উভয় সঙ্কটে পড়িয়া গৌড়-রাজের আনুগত্য স্বীকার করিয়া পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের রক্ষকস্বরূপ পাঁচজন কায়স্থ পাঠাইয়া শান্তি-স্থাপন করিলেন। এদেশের উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ ইহাঁদেরই বংশধর।

ইঁহারা রাজধানীতে পৌঁছিলে ইঁহাদের যোদ্ধবেশ দেখিয়া তাঁহাদের উপর রাজার শ্রদ্ধা হইল না। তিনি তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিলেন না। ব্রাহ্মণগণ আশীর্ব্বাদ নির্ম্মাল্য রাজদ্বারের নিকটস্থ হাতী বাঁধিবার খুঁটিতে রাখিলেন। অমনি সেই মরা গাছের ডালপাতা দেখা দিল। লোকে দেখিয়া বিস্মিত হইল। কথাটা রাজারও কাণে গেল। তখন ব্রাহ্মণগণ ও কায়স্থগণ উপযুক্ত আদর অভ্যর্থনা পাইলেন।

লোকে আজিও সে গাছটি দেখাইয়া থাকে। ইহাই রামপালের বিখ্যাত গজারী গাছ। শুনা যায়, রামপালেই নাকি মহারাজ আদিশূরের রাজধানী ছিল।

বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণ সেন

তখন পাল-রাজত্বের বৃদ্ধ বয়স। সেই সময়ে রাঢ় দেশের অধিপতি ছিলেন বিজয় সেন। তিনি প্রবল বিক্রমে পাল-সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। গৌড়রাজ পরাজিত হইলেন, একে একে রাঢ়, বঙ্গ, বরেন্দ্র ভূমি বিজয় সেনের করতলগত হইল। গৌড়বিজয়ের পর তিনি কামরূপ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং কলিঙ্গরাজকে পরাজিত করেন। ইহার পর নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামক রাজাদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রাজ্যও অধিকারভুক্ত করেন। নান্যদেব মিথিলার পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। মিথিলা জয় করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ জয় করিবার জন্য বিজয় সেন নৌ-বিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে বিজয় সেন স্বীয় বাহুবলে আসাম হইতে বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

বিজয় সেনের পরলোকগমনের পর তাঁহার যোগ্য পুত্র মহারাজ বল্লাল সেন পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করেন। বল্লালের মাতার নাম বিলাস দেবী, ইনি শূর-রাজবংশের কুমারী ছিলেন।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মহারাজ বল্লাল সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বল্লাল নামের বেশ একটা মজার গল্প আছে। শোনা যায়, বল্লাল যখন মায়ের গর্ব্ভে সেই সময়ে কোন কারণে তাঁহার মাকে নির্ব্বাসিত করা হয়। বর্ত্তমান ঢাকা সহরের উত্তরাংশে তাঁহাকে ত্যাগ করা হয়। সেকালে এসকল স্থান বনজঙ্গলে আবৃত ছিল। সেখানে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। বল্লালের মা তাঁহারই আশ্রয়ে বাস করেন। সেই আশ্রমেই বল্লালের জন্ম হয়। তিনি বনে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া সন্ন্যাসী তাঁহার নাম রাখেন বন লাল। এই 'বনলাল'ই ক্রমে পরিবর্ত্তিত হইয়া 'বল্লাল' হয়। এই সাধুপুরুষ এক দেবীমূর্ত্তির পূজা করিতেন। বল্লাল শেষে রাজা হইয়া এই দেবীর একটা সুন্দর মন্দির তৈরী করিয়া দেন। লোকে বলে, উহাই ঢাকেশ্বরীর মন্দির।

মহারাজ বল্লালের নাম বাঙ্‌লায় এখনও সজীব রহিয়াছে। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা-কৌশলে বাঙ্‌লায় যে সামাজিক প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, যাহার দ্যোতনায় তখনকার হিন্দু-সমাজ এক নূতন প্রাণ লইয়া মাতিয়া উঠিয়াছিল, বল্লাল-প্রবর্ত্তিত সেই কৌলীন্য প্রথা আজও এই সুদীর্ঘ আট শ বছর পর বাঙ্‌লার সামাজিক জীবনকে আঁকড়িয়া রাখিয়াছে। আজও বাঙ্‌লার হিন্দুর বিবাহাদি সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সততই মহারাজ বল্লালের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়।

বল্লাল একদিকে যেমন শ্রেষ্ঠ সমাজ-সংস্কারক ছিলেন, অপরদিকে তেমনি অদ্বিতীয় বীরপুরুষ ও অসামান্য বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহার রাজ্যকালে বাঙালীর হাতের অসি কোন দিন স্খলিত হয় নাই, বাঙালীর বিজয়-নিশান কখনও নমিত হয় নাই। তখন বাঙলার ঘরে ঘরে বীর ছিল, বাঙালীর বাহুতে বল ছিল, প্রাণে জ্বলন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, হৃদয়ে সাহস ছিল। তখনকার বাঙ্‌লার কাহিনী আমাদের গর্ব্বের ইতিহাস, আমাদের শাসন-ক্ষমতার ইতিহাস। আমরা সে ইতিহাস ভুলিয়াছি।

মহারাজ বল্লালের সে গৌরবের সাধের বঙ্গ-সাম্রাজ্য কত রাজ্যবিপ্লবের মধ্য দিয়া কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে! রামপালের বল্লালবাড়ীর দিকে চাহিয়া দেখ, সে বিশাল রাজপুরী নাই, দুর্গ নাই, আছে শুধু সেই বিশাল পরিখাবেষ্টিত বল্লাল বাড়ীর নিদর্শন-টুকু, আর আছে তাঁহার স্বজাতীয়দের তপ্ত দীর্ঘশ্বাস।

মহারাজ বল্লালের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনদেব রাজ্যারোহণ করেন। তিনিও পিতার ন্যায় অতি পরাক্রমশালী নরপতি ছিলেন।

লক্ষ্মণ সেন ছোটকাল হইতেই অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। গঙ্গার শাদা ধব্‌ধবে বালুকা তীরে তিনি তীর অভ্যাস করিতেন। হাতীর শুঁড়ের মত তাঁহার প্রকাণ্ড হাত দুইটিতে অসাধারণ বল ছিল। যখন তাঁহার বয়স পনর ষোল বছর সেই সময়ে তিনি কলিঙ্গদেশে জয় করেন। বর্ত্তমান উড়িষ্যাই ছিল সেকালের কলিঙ্গ। মহারাজ বল্লাল সেন তখনও বাঁচিয়া আছেন।



মহারাজ লক্ষ্মণসেন ও তাঁহার নবরত্ন সভা

কুমার লক্ষ্মণ রাজপাটে বসিবার পূর্ব্বেই কামরূপ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন বীর বিক্রমে আবার কামরূপ আক্রমণ করিলেন। কামরূপ-রাজ পরাজিত হইলেন।

পশ্চিমাঞ্চলে মহারাজ লক্ষ্মণ সেনের বাহুবলে কাশী ও কান্যকুব্জ বিজিত হইয়াছিল, পুরী, কাশী ও প্রয়াগে বঙ্গবীরের বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত হইয়াছিল। মহারাজ নিজে বীর, কবি ও ভক্ত ছিলেন। তাঁহার শাসনকালে বাঙ্‌লার চরম উন্নতি হইয়াছিল। সাহিত্য ও শিল্প চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়াছিল। লক্ষ্মণ সেন দেব ছিলেন বাঙ্‌লার বিক্রমাদিত্য। 'লক্ষণাব্দ' তাঁহার সার্ব্ব-ভৌম ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করে। মুস্লিম অধিকারের পরেও এই সাল মিথিলায় প্রচলিত ছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণসেনের যুগ বাঙ্‌লার গৌরবের যুগ। আমরা সে যুগে পাইয়াছিলাম একদল বীর বাঙালী সেনা যাহাদের বাহুবল ও বীরত্বে বাঙালীর শক্তি কামরূপ হইতে কনৌজ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা পাইয়াছিলাম নারায়ণ দত্তের মত মন্ত্রণাকুশল মহাসান্ধিবিগ্রহিক (Foreign minister) এবং মহাসামন্ত বটুদাসের মত রণপণ্ডিত। আর সেই সঙ্গে পাইয়া-ছিলাম একদল কবি, ভক্ত ও ভাস্কর। হলায়ুধ, জয়দেব, ধোয়ী, শূলপাণি, পুরুষোত্তম, বলভদ্র, পশুপতি—ইঁহারাই ছিলেন বাঙ্‌লার বিক্রমাদিত্য মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের সভার উজ্জ্বল মুকুট-মণি। সর্ব্বোপরি আমরা এমন এক মহারাজ পাইয়াছিলাম

যাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা বাঙ্‌লার জাতীয় জীবনকে সবল ও সুন্দর করিয়া তুলিয়াছিল।

মহারাজ লক্ষ্মণসেন দেবের মৃত্যুর পর বাঙ্‌লার সাম্রাজ্য, বাঙ্‌লার সম্রাট্, বাঙ্‌লার স্বাধীনতা ধীরে ধীরে কালের অতল তলে ঘোর তমিস্রার আবরণে ডুবিয়া গেল।

রাজা গণেশ

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগে গৌড়ের সিংহাসনে পাঠানরাজা। এ সময়ে বাঙ্‌লায় যে বিপ্লব-বহ্নি ধূমায়িত ছিল উহা ধীরে ধীরে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল, বাঙ্‌লার মস্‌নদ পাঠানের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া বাঙ্‌লার হিন্দুবীর আপনার হাতে দেশের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন। যিনি দেশকে বিদেশী শাসন হইতে মুক্ত করিয়া স্বাধীন হিন্দু বাঙ্‌লার আবার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তিনিই ইতিহাস-বিখ্যাত বাঙালী বীর রাজা গণেশ। "মহারাষ্ট্রের শিবাজী এবং পঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ ভিন্ন আর কোন হিন্দুরাজা সম্মুখ সমরে মুসল্‌মান ভূপতিকে নিহত করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই।"

রাজা গণেশ ভাতুরিয়া পরগণার ভূস্বামী ছিলেন। ভাতুরিয়া পরগণার অধিকাংশ এখন রাজসাহী জেলায়। রাজা গণেশ পাঠান নরপতি গিয়াসউদ্দিনের রাজসভায় একজন প্রধান আমীর ছিলেন। গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর যথাক্রমে তাঁহার পুত্র সৈফউদ্দীন ও পৌত্র দ্বিতীয় সামসউদ্দীন রাজা হন। দ্বিতীয় সামসউদ্দীনের সময়ে এই যুগান্তকারী রাষ্ট্রবিপ্লব প্রকটিত হইয়া উঠিল। সেকালে রাজসভার প্রধান আমীর-ওমরাহদের শাসন

বিষয়ে যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি ছিল। অনেক সময়ে তাঁহারাই রাজা নির্ব্বাচন করিতেন। আগেই বলিয়াছি, রাজা গণেশ একজন প্রধান আমীর ছিলেন। তাঁহার প্রকাণ্ড জমিদারী ছিল এবং আয়ও অপর্য্যাপ্ত ছিল। তাঁহার যথেষ্ট সৈন্য ছিল। এক রামা ও শ্যামা নামক সর্দ্দারদ্বয়ের অধীন তাঁহার বার হাজার সৈন্য ছিল। সেকালে বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে রামা-শ্যামার নাম আতঙ্ক ও ভীতির উদ্রেক করিত। রাজসাহী চলন বিলের উপর দিয়া নৌকা লইয়া সদল বলে যখন তাহারা "জয় মা কালী" ধ্বনি তুলিয়া চলিয়া যাইত, তখন জলস্থল কাঁপিয়া উঠিত। সর্ব্বোপরি রাজা গণেশের এক বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন—তিনি সুবিখ্যাত নরসিংহ নাড়িয়াল।

মন্ত্রী নরসিংহের কথা কবির ভাষায় অমর হইয়া রহিয়াছে—

"যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধ শ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশজাত॥
যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণা বলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥"

রাজা গণেশের সঙ্গে সামসউদ্দীনের যে যুদ্ধ হইল তাহাতে মুসলমান অমাত্যগণ পর্য্যন্ত সামসউদ্দীনকে সাহায্য করিলেন না। রাজা গণেশ তাঁহাকে অক্লেশে যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া গৌড়-সিংহাসন দখল করিলেন।

আবার দুইশত বৎসর পরে বাঙ্‌লার সিংহাসন বাঙালী রাজার অধিকারে আসিল—হউক সে অল্প কয়েক বৎসরের জন্য। কবি কি মিথ্যা বলিয়াছেন—

"দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে স্বর্গসুখ তায়!"

রাজধানী গৌড়ে আবার দেবায়তন সমূহ সগর্ব্বে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল। মন্দিরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসরের মঙ্গলারতি চলিল, ধূপচন্দনের সুবাসিত সৌরভে বাঙলার বাতাস মাতিয়া উঠিল। দেববাণী সংস্কৃত নূতন প্রাণ পাইয়া হাসিয়া উঠিল। হিন্দুর হিন্দুয়ানী আবার শির তুলিয়া দাঁড়াইল। জাতি যেন নব জীবনের পরশ পাইয়া একবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

মহারাজ গণেশনারায়ণ নির্ভীক ও পরোপকারী ছিলেন। অন্যায় দেখিলে জীবন বিপন্ন করিয়াও তাহার প্রতিকার করিতেন। তাঁহার জীবনের অনেক গল্পেই আমরা ইহার পরিচয় পাই।

একবার এক উচ্চ বংশীয় মুস্‌লিম যুবক কয়েকজন দুর্ব্বৃত্ত সৈন্য লইয়া একজন অসহায় হিন্দু যুবতীর অবমাননার চেষ্টা করে। সেই সময়ে রাজা গণেশ এক মাত্র অসি হস্তে সেই দুর্ব্বৃত্তদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং যুবতীকে রক্ষা করিলেন। ধর্ম্ম ও ন্যায়ের জন্য এমন ভাবে নিজের জীবন দিয়া পরোপকার করিতেন বলিয়াই লোকের মনের উপর তাঁহার এত বড় আধিপত্য ছিল।

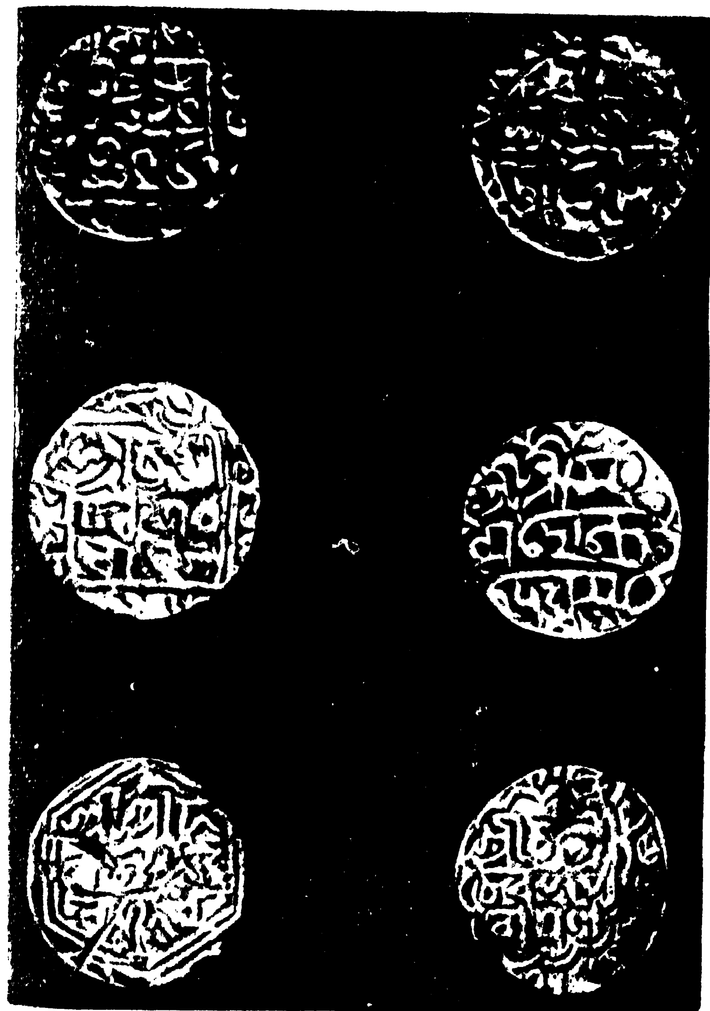
মহারাজ দনুজমর্দ্দন ও মহেন্দ্র দেব

"রাজা গণেশ বঙ্গে যে নবীন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা তখনো বাঙালীর পঞ্জরে ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। তখনো বঙ্গের হিন্দুগণ একেবারে নির্জ্জিতবীর্য্য হন নাই, তখনো উপযুক্ত নেতা পাইলেই বঙ্গবীর, মুসলমান-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না।"

ইহার সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেব। রাজা গণেশের পুত্র জিতমল্ল রাজকুমারী আসমানতারাকে বিবাহ করিয়া মুসলমান হন এবং জেলালুদ্দিন নাম গ্রহণ করেন। তাঁহার ধর্ম্মান্ধতা ও অত্যাচার যখন অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন বাঙালী আবার দলে দলে দনুজমর্দ্দন দেবের রক্ত-পতাকা তলে দাঁড়াইয়া হুঙ্কার ছাড়িল—

"জাগোহে পীড়িত অত্যাচারিত জাগো দুর্ব্বল দল।"

সে হুঙ্কারে তাঁহার সিংহাসন কম্পিত হইল। পাঠান সেনা তাহা রক্ষা করিতে পারিল না। প্রজা সাধারণের জয়-জয়কারে শ্রীদনুজমর্দ্দন গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। রাজধানী পাণ্ডুয়া হিন্দুর বিজয়-স্মৃতিতে শোভিত হইল। পাণ্ডুয়া, সোনারগাঁ, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে তাঁহার টাকশাল প্রতিষ্ঠিত



মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবের মুদ্রা

হইল। শ্রীদনুজমর্দ্দন দেব নামাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা প্রচারিত হইয়া দেশ বিদেশে বঙ্গরাজের শক্তির পরিচয় জানাইল। সে কালে আর কোন হিন্দু রাজা স্বদেশীয় ভাষায় নিজ নামে মুদ্রা প্রচার করিতে সাহসী হন নাই।

শ্রীদনুজমর্দ্দন দেবের পর মহেন্দ্র দেব গৌড়রাজরূপে পাণ্ডুয়ায় অভিষিক্ত হইলেন। মহেন্দ্র দেবের রৌপ্যমুদ্রা রাজধানী হইতে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। তিনিও কিছুকাল বাঙ্‌লায় হিন্দু-মুসলমানের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পর বঙ্গবীর্য্য আবার ঘোর তমিস্রায় ডুবিয়া গেল। বাঙ্‌লায় বাঙালীর শাসন লোপ পাইল।

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

"যশোর নগর ধাম, প্রতাপ-আদিত্য নাম,
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
কেহ নাহি আঁটে তায় নাহি মানে পাতসায়,
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ॥
বরপুত্র ভবানীর, প্রিয়তম পৃথিবীর,
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকা হাতী, অযুত তুরঙ্গ সাথী,
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী॥"

বাঙ্‌লার স্বাধীনতালিপ্সু যে সমস্ত বীর মুক্তি-আহবে জীবন দান করিয়া বাঙালীর অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের অগ্রণী যশোরের মহারাজ প্রতাপাদিত্য। মুসলিম অধিকারে বাঙালী কোন দিন একেবারে শান্ত নির্জীব হইয়া পড়ে নাই, বাঙালী কোনদিন অম্লানবদনে পরের শাসন মাথা পাতিয়া মানিয়া লয় নাই। যখনই বাঙালী সুবিধা পাইয়াছে অমনি গা' ঝারা দিয়া পরাধীনতার কলঙ্ক মুছিতে প্রয়াস পাইয়াছে। একথা ঠিক, কোন জাতিকে সেই জাতির সম্মতি ব্যতীত বেশীদিন অধীন রাখা যায় না। আর বাঙ্‌লার ইতিহাস হইতে আমরা ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাই।



মহারাজ প্রতাপাদিত্য

প্রতাপের জন্ম হয় ধূমায়িত বিপ্লবের মাঝে। বাঙ্‌লায় তখন পাঠান-শাসন বিলুপ্তপ্রায়, মোগল দিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত, উড়িষ্যার হিন্দুবীরগণের মুসলমানদের সহিত ঘোরতর রণারণি। এই পরিবর্ত্তনময় বিপ্লবের যুগে সে যুগের শ্রেষ্ঠবীর বাঙলার বুকে স্বাধীনতার ধ্বজা উত্তোলনে আত্মনিয়োগ করিলেন। পনর শ' ষাটের ঘরে প্রতাপের জন্ম হয়। তখন দিল্লীর বাদশাহ আকবর শাহ্।

প্রতাপের বাবা বিক্রমাদিত্য ও খুড়া বসন্ত রায় এই দুই ভাই মিলিয়া সুন্দর বনে যশোহর রাজ্যের নূতন প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নদনদীবহুল দুর্ভেদ্য সুন্দরবনে রাজ্য শত্রুর পক্ষে দুর্গম হইয়াছে, রাজ্যের লোকেও শান্তিসুখের স্পার্শ পাইয়াছে। এই নূতন নগরী ঐশ্বর্য্যে ও সম্পদে গৌড়ের যশ হরণ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম যশোহর হইল।

গৌড়নগরে সেকালের প্রথা অনুসারে প্রতাপ আরবী ও পারসি ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। যশোহরে আসিয়া উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট অস্ত্রবিদ্যা, মল্লক্রীড়া, অশ্বারোহণ প্রভৃতি পৌরুষ-জনক বিদ্যায় বিশেষরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। শরচালনা ও অশ্বারোহণে তাঁহার মত সুদক্ষ সেকালে ছিল না। এ সম্বন্ধে একটি ছোট গল্প আছে। একদিন প্রতাপ একটি উড্ডীয়মান চিলের ডানায় শর বিদ্ধ করিয়া উহাকে ভূপাতিত করেন। আহত চিলটি বিক্রমাদিতের সম্মুখে পতিত হয়। বিক্রমাদিত্য অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, এ কাজ প্রতাপের। তখন তিনি

এই অনাবশ্যক নিষ্ঠুরতার জন্য প্রতাপকে ভৎর্সনা করিলেন। কিন্তু বসন্ত রায় প্রতাপের এরূপ পারদর্শিতার অত্যন্ত প্রশংসা করিলেন, বিক্রমাদিত্যকে বলিলেন, প্রতাপ কালে একজন বীর পুরুষ হইবে। এই সময়ে প্রতাপের দুইজন সহচর জুটে—ইঁহাদের নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী ও সূর্য্যকান্ত গুহ। ইঁহারা পরবর্ত্তী কালে বড় বড় সেনাদল পরিচালনা করিয়া প্রতাপের শত্রুর বিরুদ্ধে বহুবার সমরাঙ্গণে অবতীর্ণ হইয়া প্রতাপকে সহায়তা করিয়াছেন। প্রতাপ অধিকাংশ সময়ই এই সমস্ত বন্ধুর সহিত সুন্দরবনের দুর্গম প্রদেশে ভীষণ ব্যাঘ্র, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যজন্তু শীকার করিয়া অসীম স্ফূর্ত্তি পাইতেন। মৃগয়া কালে প্রতাপ অসাধারণ সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা ও ক্লেশসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিতেন। বন্দুক চালনায় প্রতাপ অসামান্য কৃতিত্ব দেখাইতেন।

প্রতাপের মনে সেই সময় হইতেই স্বদেশের স্বাধীনতা উদ্ধারের সঙ্কল্প জাগে। তিনি অবসর সময়ে বন্ধুগণসহ এবিষয়ে চিন্তা ও আলোচনা করিতে থাকেন। প্রতাপের যুদ্ধপ্রিয় প্রবৃত্তি কোন মতেই যেন বিদেশীয় শাসনে পোষ-মানা রহিত না—তাঁহার প্রাণের উদ্দাম গতি পূর্ণ স্বাধীনতার রাজ্যে ধাবিত হইত, তাঁহার কোমল মস্তিষ্ক নানারূপ অসম সাহসিক চিন্তায় আলোড়িত হইত। কতদিন যশোরের সবুজ প্রান্তরে নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া স্বদেশের কথা ভাবিতেন, চোখের জল দরদর প্রবাহিত হইত, অমনি গা ঝাড়া দিয়া উঠিয়া পড়িতেন, চোখে আগুন ছুটিত, সঙ্কল্প সুদৃঢ় হইত, অন্তরাত্মা বলিয়া উঠিত—স্বদেশের স্বাধীনতা চাই-ই।

মোগল ও পাঠানে আমার সোনার জন্মভূমি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতেছে, ছিনিমিনি খেলিতেছে আর আমি নিশ্চেষ্ট বসিয়া আছি, আমার তো বসিয়া থাকিলে চলিবে না।

প্রতাপের অসম সাহসিকতা, প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও উচ্ছৃঙ্খল জীবন বিক্রমাদিত্যের ততটা পছন্দ হইত না। তাঁহার উদ্দাম প্রকৃতি শান্ত করিবার জন্য বিক্রমাদিত্য প্রতাপকে আগ্রা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। আগ্রা তখন মোগল রাজধানী। তিনি মনে করিলেন, হয় ত রাজধানীর ঐশ্বর্য্য ও সৈন্যসম্ভারের পরিচয় পাইলে প্রতাপের মুক্তিতৃষ্ণা ক্ষীণ হইয়া আসিবে, আত্মীয়স্বজনের অদর্শনে তাঁহার কোমল মনোবৃত্তি স্বতঃই জাগিয়া উঠিবে, এবং তাঁহার হৃদয়ের সৈনিকসুলভ কঠোরতাও মন্দীভূত হইবে।

শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, সুন্দর প্রভৃতি সহচরদিগকে সঙ্গে করিয়া সুসজ্জিত নৌকায় প্রতাপ আগরা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নানাদেশের ভিতর দিয়া কত ঐতিহাসিক নগর দেখিতে দেখিতে ইতিহাসের প্রাচীন কাহিনী আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা আগরায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আগরা আসিয়া বাদ্‌শাহ্ আকবরের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং কিছুদিনমধ্যে এই তরুণ যুবক সম্রাট্ আকবর শাহের বিশেষ প্রীতিভাজন হইলেন। এখন হইতে প্রতাপ সাম্রাজ্যের বড় বড় কর্ম্মচারীর সহিত মিশিবার এক মস্ত সুযোগ পাইলেন।

মোগলশাসনের কেন্দ্র আগরায় বসিয়া প্রতাপ মোগলের

শাসন-প্রণালী, যুদ্ধ-কৌশলাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। তিনি দেখিলেন, ভারতের বীর ও কর্ম্মকুশল হিন্দুগণ অনেকেই মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিয়া এই বিশাল সাম্রাজ্য পরিচালনা করিতেছেন। মানসিংহ, ভগবান্ দাস, বিহারী মল, টোডর মল প্রভৃতি মনস্বীদিগের সহায়তায় মোগল শক্তি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আবার সেই সঙ্গে সঙ্গে যখন দেখিতেন মেবারের মহারাণা প্রতাপসিংহ মোগল প্রভুত্ব অগ্রাহ্য করিয়া স্বীয় রক্ত-পতাকা সগর্ব্বে উত্তোলন করিয়াছেন, তখন প্রতাপের হতাশ মুখমণ্ডলে আশার বিদ্যুৎরেখা মুহূর্ত্তের জন্য উদ্ভাসিত হইত। এইরূপে প্রতাপ ও তাঁহার সহচরগণ মোগল সাম্রাজ্যের মস্তিষ্কের সহিত পরিচিত হইয়া তাহাদিগের শাসন-কৌশল ও শক্তি-সামর্থ্য সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিছু কাল গত হইলে যশোররাজ্যের ফার্ম্মান নিজের নামে সম্রাটের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়া বহু সৈন্যসামন্তসহ স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। স্বদেশ উদ্ধারই এখন হইতে তাঁহাদের একমাত্র ব্রত হইল। এই ব্রত উদ্‌যাপন করিবার জন্য পথের সমস্ত বাঁধা অসঙ্কুচিত চিত্তে দূর করিয়া দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

স্বদেশে আসিয়া প্রতাপ স্বাধীনতা সংস্থাপনের জন্য শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, মদন, সুন্দর, প্রমুখ বীরবৃন্দের সহিত নব উদ্যমে কার্য্য আরম্ভ করিলেন। "প্রতাপ, এই সময় হইতে আপনার রাজ্যের প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন, স্বভাবদুর্গম সুন্দরবন প্রদেশে বহুসংখ্যক খাল খনন করিয়া এ

প্রদেশকে অধিকতর দুর্গম করিয়া তুলিলেন। এই সময় হইতে প্রতাপ, শ্রমজীবী সৈন্য নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করেন। ইহারা এরূপ কার্য্যদক্ষ হইয়াছিল যে অল্প সময়ের মধ্যে শুষ্কভূমি নদীরূপে পরিণত করিত এবং বিস্তৃত গভীর অরণ্য ক্ষেত্ররূপে পরিবর্ত্তিত করিত। প্রতাপ এই সকল শ্রমজীবী সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক অভেদ্য মৃণ্ময় দুর্গ নির্ম্মাণ ও সুস্বাদু সলিলপূর্ণ সরোবর খনন করেন।

"দূরদর্শী প্রতাপ, পর্টুগীজ জলদস্যুদিগকে দমন ও প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবযানসমূহ প্রস্তুত করেন। কালক্রমে প্রতাপ নৌবলে এরূপ বলীয়ান্ হইয়াছিলেন যে, মোগল মগ বা পর্টুগীজেরা তাঁহার সম্মুখীন হইতে সাহসী হইত না। সাগরদ্বীপ প্রতাপের নৌবহরের বড় আড্ডা ছিল।

"সুচতুর প্রতাপ মোগলশক্তি উচ্ছেদ করিবার জন্য মোগল রাজপুরুষদিগের চক্ষে ধূলি প্রদান করিয়া ধীরে ধীরে অতি গোপন ভাবে স্বদেশবাসীদিগের মধ্যে সামরিক শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ধনুর্ব্বাণ, খড়গ এবং বন্দুক ব্যবহারে সকলকে সিদ্ধহস্ত করিবার জন্য তিনি সকলকে সবিশেষ উৎসাহ প্রদান করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যে অনেকেই শরচালনায় বিশেষ দক্ষতা লাভ করিতে লাগিলেন। গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, নগরে নগরে যুবকবৃন্দ ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত করিয়া পরম উৎসাহের সহিত অস্ত্রশস্ত্র চালনার বিশেষরূপে চর্চ্চা করিতে লাগিল। প্রতাপ বৈদেশিক বণিকদিগের

নিকট প্রচুর পরিমাণে বন্দুক আদি যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য ক্রয় করিয়া সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরূপে অল্পসময়ের মধ্যে দেশমধ্যে সামরিক শক্তি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। কিছুদিন পূর্ব্বে যাহারা ভীরু কাপুরুষ বলিয়া আখ্যাত হইত তাহারা এক্ষণে ভীষণ জন্তু অথবা শত্রু সংহার করিবার জন্য সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সকলের বিস্ময় উৎপাদন করিতে লাগিল।”

এই সময়ে প্রতাপের পিতৃবিয়োগ হয়। পিতার শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া সুসম্পন্ন করিয়া তিনি উড়িষ্যা গমন করেন। এই সময়ে উৎকলবাসিগণ মোগল ও পাঠানদিগের সহিত খণ্ড খণ্ড যুদ্ধে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিতেছিলেন। প্রতাপ উড়িষ্যায় যাওয়ার কালে বসন্তরায় তাঁহাকে উৎকলেশ্বর নামক শিব ও গোবিন্দদেব নামক শ্রীকৃষ্ণের কমনীয় বিগ্রহ আনিতে আদেশ করেন। এই দুই বিগ্রহ উৎকলীদিগের অত্যন্ত প্রিয় দেবতা। বিগ্রহদ্বয় আনিবার কালে উৎকলীদের সহিত প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে বাঙালী সেনাবৃন্দ ও শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি প্রতাপের সহচরগণ অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া উৎকলীদিগকে সুবর্ণরেখাতটে পরাজিত করেন। ইহাতে বাঙ্‌লায় এক নূতন প্রাণের সাড়া পড়িয়া গেল। বাঙালীর মুক্তিপন্থী বীরহৃদয় নবোৎসাহে নাচিয়া উঠিল।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া আবার প্রতাপ স্বদেশ-উদ্ধার ব্রতে মনপ্রাণ ঢালিয়া দিলেন। শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরবৃন্দ প্রাণপণ পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। রাজ্যের চতুর্দ্দিক সুরক্ষিত

করিবার জন্য দুর্ভেদ্য দুর্গ সকল প্রস্তুত করিলেন। বর্ত্তমান নৈহাটির অদূরে ভাগীরথী তীরে জগদ্দল দুর্গ নির্ম্মিত হইল। সালিকাদুর্গ, রায়গড়, মাতলাদুর্গ প্রভৃতিও এই সঙ্গে সঙ্গে নির্ম্মিত হইল। প্রতাপ এই সময়ে যশোহরের কয়েক মাইল দূরে ধূমঘাট নামক স্থানে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দশ মাইল ব্যাপী এক প্রকাণ্ড দুর্গ ও নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাই প্রতাপের নূতন রাজধানী। এই দুর্গ দুর্ভেদ্য, সুরক্ষিত ও কামান-শোভিত ছিল। ধূমঘাট নির্ম্মিত হইলে বাঙ্‌লার অন্যান্য ভূস্বামিগণ গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ ভদ্রলোক, হিন্দু মুসলমান পর্ত্তুগীজ—সকলের সমক্ষে প্রতাপের অভিষেক-ক্রিয়া অতি সমারোহে সম্পন্ন হয়। ধূমঘাটের প্রাকার হইতে মুহুর্ম্মুহু তোপধ্বনিতে রাজ্যাভিষেক-বার্ত্তা ঘোষিত হইল। ইহার পর হইতে প্রতাপের নিজ নামে মুদ্রা প্রচারিত হইল।

খুড়া বসন্ত রায় প্রতাপকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। বাল্যকাল হইতেই মাতৃহীন হইয়া খুড়ীমার নিকট প্রতাপ লালিত পালিত হইয়াছেন। কিন্তু কালক্রমে বসন্তরায়ের উপর প্রতাপের অত্যন্ত বিদ্বেষ জন্মিল। অবশেষে উহা শত্রুতায় পরিণত হইল। প্রতাপের পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বেই বিষয় সম্পত্তি পৃথক করিয়া দিয়াছিলেন। তারপর ধূমঘাটে প্রতাপ পৃথক রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। একবার বাৎসরিক পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে বসন্তরায়ের বাড়ীতে প্রতাপ নিমন্ত্রিত হন। প্রতাপ ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র শুনিলেন, শ্রাদ্ধ ক্রিয়াতে রত বসন্তরায় চাকরকে গঙ্গাজল আনিতে আদেশ দিতেছেন। বসন্তরায়ের গঙ্গাজল নামে

একখানা তরবারী ছিল। প্রতাপ ভাবিলেন, তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্যই এই ফন্দি। তিনি অম্‌নি তাঁহার লুক্কায়িত তরবারী বাহির করিলেন।

এদিকে বসন্তরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দ রায় পিতার ঘরের নিকট প্রতাপকে তরবারী বাহির করিতে দেখিয়া নিজের ধনুর্ব্বাণ লইয়া প্রতাপের মাথা লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িলেন। তীর প্রতাপের চুলের ডগা ছুঁইয়া গেল, কিন্তু প্রতাপের অসির আঘাতে গোবিন্দরায়ের মাথা কাটা গেল।

এই ঘটনায় প্রতাপ বুঝিতে পারিলেন, নিশ্চয়ই তাহাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র আছে। এদিকে বসন্তরায়ের অন্যান্য ছেলে এবং তাঁহার পরিজন প্রতাপকে একযোগে আক্রমণ করিলেন। বসন্তরায় ব্যাপার দেখিয়া গঙ্গাজল তরবারী আনিতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই প্রতাপের অসির আঘাতে বসন্ত রায় নিহত হইলেন। বসন্ত রায়ের পত্নী একমাত্র শিশুপুত্র রাঘবকে লইয়া খিড়কীর দরজা দিয়া পলাইয়া কচুবনে আশ্রয় লইলেন। সেই হইতে রাঘব রায়ের নাম কচুরায় বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। একটা ভুলের জন্য কী কাণ্ডটাই হইয়া গেল!

এই সময়ে হিজলীপতি ঈশাখাঁ মছন্দরী প্রতাপের শক্রতা সাধন করাতে প্রতাপ তাঁহার বিরুদ্ধে গমন করেন। প্রতাপ যশোরেশ্বরীর পূজা সমাপন করিয়া মহাসমারোহে জাহাজঘাটায় (এখানে প্রতাপের জাহাজ রক্ষিত ও নির্ম্মিত হইত) সদলবলে

জাহাজ চাপিয়া রসিলেন। মছন্দরীর রাজ্যে পৌঁছিয়া অশ্বারোহী, পদাতিক, জলসৈন্য সকলে চারিদিক হইতে একযোগে আক্রমণ করিল। শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, রঘু, মদন প্রত্যেকে নিজ নিজ সেনাদল সহ ভীষণ ভাবে শত্রুর উপর আপতিত হইলেন। ফিরিঙ্গি-নায়ক রডা ভীষণ গোলার আঘাতে ঈশাখাঁর সেনাদলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর মছন্দরী ও তাঁহার সেনাপতি বলবন্ত যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলে, সেনাদল রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। প্রতাপ বিজয়ী বীরবেশে স্বদেশে উপস্থিত হইলেন।

প্রতাপ এখন বুঝিলেন, ভবিষ্যতে মোগলের সহিত সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী। সেজন্য সর্ব্বপ্রকারে দেশকে সংহত ও সুরক্ষিত করিতে লাগিলেন। নূতন নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইল, নানাপ্রকার অস্ত্র তৈরী হইল, খাদ্যাদি দুর্গে দুর্গে সংগৃহীত রহিল, জাহাজাদি নির্ম্মাণ করিয়া নৌবল পুষ্ট করা হইল। দলে দলে যুবকবৃন্দ সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে লাগিল। ধূমঘাট সমর-সজ্জার কেন্দ্রভূমি হইল। মাঠে মাঠে সৈন্যদলের কৃত্রিম যুদ্ধ চলিতে লাগিল। প্রতাপের গুপ্তচর, মোগল কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাদের স্বভাব-চরিত্র বিদ্যা-বুদ্ধি শক্তি-সামর্থ্য সূক্ষ্মরূপে অধ্যয়ন করিতে নিযুক্ত হইল। স্বয়ং শঙ্কর দেশময় ঘুরিয়া ঘুরিয়া সৈন্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইলেন। সূর্য্যকান্ত, মদন, প্রতাপসিংহ, সুন্দর, সুখময়, রডা, প্রত্যেকে এক এক কাজের ভার লইয়া সুচারুরূপে প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে একদিন রাজমহলের মোগল কর্ম্মচারী সের খাঁ, শঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে বন্দী করেন। প্রতাপ কারাগারের প্রহরীকে যথেষ্ট অর্থে বশীভূত করিয়া রাত্রিকালে শঙ্করকে ছিনাইয়া আনেন। ইহাতে সের খাঁ ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য স্বয়ং পরিচালনা করিয়া যশোহর অভিমুখে অভিযান করিলেন।

সেরখাঁর আগমন কথা শুনিয়া প্রতাপ তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য সেনাদল দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এক ভাগের সেনানায়ক হইলেন শঙ্কর, অপর ভাগের নেতৃত্ব সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি সহ প্রতাপ নিজের হাতে গ্রহণ করিলেন। উভয় পক্ষের সেনা-দলের রণারণিতে, মুহুর্ম্মুহু কামানের গর্জ্জনে রণস্থল ভীষণ হইয়া উঠিল। মোগল সেনাদল ভীষণ ভাবে শঙ্করকে আক্রমণ করিল, শঙ্কর কৌশল করিয়া ধীরে ধীরে পিছনের জলাভূমির দিকে হঠিতে লাগিলেন। মুসলমান সেনাদল পলায়নপর শঙ্কর-সেন্যর দিকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে অগ্রসর হইবামাত্র শঙ্কর অকস্মাৎ স্বীয় সৈন্যদল সংহত করিয়া মোগলের উপর পতিত হইলেন। ঠিক এই সময়ে পশ্চাৎ ভাগে লুক্কায়িত প্রতাপের সেনা নবীন প্রতাপে মোগল সেনাদল আক্রমণ করিল। মোগল অশ্বারোহীদল জলাভূমির কর্দ্দমে নিমগ্ন হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। সূর্য্যকান্ত ও প্রতাপ সিংহের সেনাদল অমিত বিক্রমে মোগল সেনা আক্রমণ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল। অনন্যোপায় সেরখাঁ কতিপয় সঙ্গীসহ যুদ্ধস্থল ত্যাগ করিলেন। বাঙালী সেনার বিজয়রবে সারা বাঙলায় এক সাড়া পড়িয়া গেল।

ঈশাখাঁ মছন্দরী ও সেরখাঁর পরাজয় সংবাদ আগরায় পৌঁছিলে সম্রাট্ আকবর বহুসংখ্যক সৈন্যসহ সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁকে প্রতাপের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। প্রতাপ যখন শুনিলেন ইব্রাহিম খাঁ সপ্তগ্রাম হইতে নৌকাযোগে দক্ষিণাভিমুখে আসিতেছেন তখন তিনি সৈন্য পাঠাইয়া মাতলা দুর্গ সুদৃঢ় করিলেন। কলিকাতার দক্ষিণে রায়গড় নামক দুর্গের নিকট ইব্রাহিম খাঁর সৈন্যের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। উভয় পক্ষে অনবরত ভীষণ গোলাবৃষ্টি করিয়াও কেহ কাহারো বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারিল না। প্রতাপ, রায়গড় আক্রান্ত হইয়াছে শুনিয়া কমল খোজা, সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বীরগণকে কতকগুলি কর্ম্মঠ, ক্লেশসহিষ্ণু, অসম সাহসিক সেনাসহ রাত্রিকালে দ্রুতগামী নৌকাসহযোগে মোগল সেনার পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন। ইহারা অকস্মাৎ মোগলসেনার উপর পতিত হইয়া তাহাদের শিবিরে আগুন ধরাইয়া পশ্চাৎ ভাগ আক্রমণ করিয়া বসিল। মোগল সেনা দিশাহারা হইয়া যে যেদিকে পারিল পলাইয়া বাঁচিল। তৎপর বাঙালী সেনাদল আবার নৌকাপথেই মাতলা দুর্গে চলিয়া আসিল।

ইব্রাহিম খাঁ রায়গড়ে অনর্থক কালক্ষেপ না করিয়া কিছু সৈন্য অবরোধের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া মাতলা অভিমুখে গমন করিলেন। মাতলার নিকট আসিবামাত্র দুর্গ হইতে অবিরত গুলি বর্ষণ হইতে লাগিল, রডাও নৌসেনা সহ মোগলদিগকে আক্রমণ করিলেন। অপর দিকে স্থলপথে সূর্য্যকান্ত, শঙ্কর প্রমুখ সেনানীগণ ভৈরব বিক্রমে মোগল সেনা

আক্রমণ করিলেন। ইব্রাহিম খাঁ কিছুতেই সৈন্যদল সংহত রাখিতে পারিলেন না। রডার সেনাদল পশ্চাদ্ধাবিত মোগল সেনাকে অনুসরণ করিয়া আরও বিপন্ন করিয়া তুলিল।

ইব্রাহিম খাঁ প্রতাপের প্রজাদের মনে ভীতি উৎপাদনের জন্য একদল সেনা ডায়মণ্ডহারবারের দিকে পাঠাইয়া দেন। প্রতাপ, মোগল সেনার অত্যাচার কাহিনী শুনিবামাত্র উহাদিগকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিয়া দিলেন। আজিও সে যুদ্ধস্থল সংগ্রামপুর নামে অভিহিত হইয়া সেই সংগ্রাম-কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়।

সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি রায়গড়ের অবরুদ্ধ সেনাদলের সাহায্যার্থ ছুটিয়া চলিলেন। এই সময়ে মাতলার ধ্বংসাবশিষ্ট মোগল সেনাদল রায়গড়ের মোগলসেনার সঙ্গে যোগদান করিল। সূর্য্যকান্ত, রডা, কমলখোজা প্রমুখ বঙ্গ-সেনানীগণ ভীষণ ভাবে মোগলকে আবার আক্রমণ করিলেন। মোগলগণ বিহ্বল হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়া বাঁচিল।

প্রতাপ বিজয়লব্ধ বহুবিধ সামগ্রীসহ রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া মহাসমারোহে যশোরেশ্বীরর পূজা করিলেন।

এই সময়ে প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থ বলে বলী রাজা বঙ্গদেশে আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার যুদ্ধ-সামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা ও বিশ হাজার পাইক এবং সেকালের পনর লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য ছিল। এই কথা সেই সময়ের প্রতাপের শত্রুপক্ষীয় একজন মুসলমান লেখক লিখিয়াছেন।

প্রতাপের রাজ্যের গৌরব দিন দিন বিস্তৃত হইতেছিল। পণ্ডিত, কবি ও অন্যান্য গুণিগণ তাঁহার দরবারে উপস্থিত হইয়া পুরস্কৃত হইতেন। প্রতাপাদিত্যের দানও অসাধারণ ছিল। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাস তাঁহার গানে প্রতাপের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

সম্রাট্ আকবর প্রতাপের ক্ষমতা নির্ম্মূল করিবার জন্য অতঃপর আজিম খাঁ নামক অপর এক সেনাপতিকে বহু রণনিপুণ সেনা সমভিব্যাহারে বাঙ্‌লায় প্রেরণ করিলেন। আজিম নির্ব্বিঘ্নে পাটনা ও রাজমহল অতিক্রম করিয়া আসিলেন, প্রতাপের পূর্ব্ব নির্দ্দেশমতে কেহ তাহাকে বাঁধা দিল না। বিনা রক্তপাতে বাঙ্‌লা অধিকৃত হইতেছে মনে করিয়া আজিমের উল্লাসের আর সীমা রহিল না। তিনি একেবারে কলিকাতার নিকট আসিয়া বাঙ্‌লার শ্যামল প্রান্তরে শিবির খাটাইয়া নিরুদ্বেগে বিশ্রাম সুখ উপভোগ করিতে লাগিল। এদিকে প্রতাপ নিশীথ রাত্রে দলবলসহ হঠাৎ চতুর্দ্দিক হইতে ভীষণ বিক্রমে মোগল সেনা আক্রমণ করিয়া বসিলেন। সমস্ত রাত্রি যুদ্ধ চলিল। বহু মোগল সেনা শাণিত কৃপাণের মুখে পড়িয়া খণ্ড খণ্ড হইতে লাগিল। এই ভীষণ যুদ্ধে প্রায় বিশ হাজার মোগল সৈন্য নিহত ও বন্দী হয়। প্রচুর যুদ্ধোপযোগী বহুমূল্য দ্রব্যে প্রতাপের রাজকোষ পূর্ণ হইল।

পরিশেষে কাবুল-বিজয়ী সেনাপতি মানসিংহ বাঙ্‌লা, বিহার ও উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া প্রতাপকে দমন

করিবার জন্য প্রেরিত হইলেন। মানসিংহ রাজপুত ও মোগল সৈন্যের এক বিশালবাহিনী সহ বঙ্গদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়ে ভবানন্দ মজুমদার প্রভৃতি কয়েকজন বঙ্গ-কুলাঙ্গার ঘরের খবর বলিয়া না দিলে এবং মানসিংহের বিপদে রসদ যোগাইয়া সাহায্য না করিলে, বোধ হয় কাবুল-বিজয়ী মানসিংহকে বঙ্গবীরের নিকট হতমান হইয়াই ফিরিয়া যাইতে হইত। বস্তুতঃ গৃহশত্রুই বড় শত্রু। মানসিংহের বঙ্গ-বিজয় রাজপুত ও মোগল ভুজবলের উপর যত না নির্ভর করিয়াছিল তার চেয়ে শতগুণে বেশী নির্ভর করিয়াছিল এই গৃহশত্রুর সহায়তা ও পরামর্শের উপর।

মানসিংহের বাঙ্‌লায় আসিয়া উপস্থিত হইবার সংবাদ পাইবামাত্র প্রতাপ, ভাগীরথীর উভয় তীর রক্ষার জন্য এবং তাঁহার গতিরোধ করিবার জন্য ফিরিঙ্গি সেনাপতি রডাকে প্রেরণ করিলেন। রডা ভাগীরথীর তীরে একখানা নৌকাও রাখেন নাই—হয় দূরে পাঠাইয়া দিয়াছেন, নয় জলে ডুবাইয়া রাখিয়াছেন। মানসিংহ দ্রুত গঙ্গাতীরে আসিয়া যখন নদী পার হইবার জন্য চিন্তিত সেই সময়ে কুলাঙ্গার স্বজাতিদ্রোহী ভবানন্দ তাঁহার সঙ্গে দেখা করিয়া গোপনে নৌকা সাহায্যে নদী পার করাইয়া দিলেন। মানসিংহ নদী পার হইবামাত্র সপ্তাহ কাল ধরিয়া প্রবল ঝড়-বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সে ঝড়-বৃষ্টির দুর্দ্দশার কাহিনী ভারত কবি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

ঘন ঘন ঘন গাজে।
শিলা পড়ে তড় তড় ঝড় বহে ঝড় ঝড়
হড় মড় কড় মড় বাজে ॥

দশদিক আন্ধার করিলা মেঘগণ।
দুনো হয়ে বহে ঊনপঞ্চাশ পবন ॥
ঝড়ে উড়ে কানাত দেখিয়া উড়ে প্রাণ।
কুঁড়ে ঠাট উড়িল তাম্বুতে এল বান ॥
সাঁতারিয়া ফিরে ঘোড়া, ডুবে মরে হাতী।
পাঁকে গাড়া গেল গাড়ী, উট তার সাতি ॥
ফেলিয়া বন্দুক জামা পাগ তল্‌বার।
ঢাল বুকে দিয়া দিল সিপাই সাঁতার ॥
বাপ বাপ মরি মরি হায় হায় হায়।
উভরায় কান্দে লোক যায় যায় যায় ॥
কাঙ্গালী হইনু সবে বাঙ্গালায় এসে।
শির বেচে টাকা করি সেহ যায় ভেসে ॥

এই বিপদের উপর আবার অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। তখনও স্বদেশদ্রোহী ভবানন্দ—

নায়ে ভরি লয়ে নানাজাতি দ্রব্যজাত।
রাজা মানসিংহে গিয়া করিলা সাক্ষাৎ ॥

এ সাহায্য না পাইলে মোগলসৈন্যের বঙ্গ-বিজয় দূরের কথা, জীবন রক্ষাই দুর্ঘট হইয়া উঠিত। মানসিংহ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সেনাপতিদিগের ন্যায় এবার আর জলপথে গেলেন না। তিনি

বুঝিলেন, প্রতাপ নৌবলে অতি প্রবল। নৌযুদ্ধে তাঁহার সহিত সহজে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না। সেইজন্য স্থলপথে এক প্রশস্ত রাস্তা প্রস্তুত করিতে করিতে যশোর অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। প্রতাপেরও এই দৈবদুর্বিপাকে কম ক্ষতি হয় নাই। তাঁহার যুদ্ধোপকরণসহ রণতরী সমূহ একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

এদিকে মানসিংহ, যশোহরের পথে শিবির স্থাপন করিয়া মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সভায় দূত পাঠাইলেন। যখন প্রতাপের সভায় মানসিংহের দূত অসি ও শৃঙ্খল লইয়া উপস্থিত হইল, প্রতাপের ইঙ্গিতে কেশবভট্ট উত্তর দিলেন—হে দূত, বার্ত্তাবহ শাস্ত্রমতে অবধ্য। সেইজন্য এখনও তুমি জীবিত রহিয়াছ। যাও তোমার সেনানী যেখানে আছে, তাঁহাকে বল যথাসাধ্য রণ করিতে। অসিই প্রতাপাদিত্যের ধর্ম্ম, অসিই স্বর্গ, অসিই তাঁহার ব্রত ও তপস্যা, অসিই প্রাণ, অসিই ধন। এই আমি অসি লইলাম।

মানসিংহ সতর্কতার সহিত সৈন্যব্যূহ রচনা করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। অপর পক্ষে মহারাজ প্রতাপাদিত্যের আদেশ অনুসারে মহাবীর শঙ্কর, সেনাপতি সূর্য্যকান্ত, পূর্ব্বদেশীয় সেনাপতি রঘু, ফেরঙ্গপতি রডা, গুপ্ত সেনাপতি সুখা, ঢালীপতি মদন, রাজকুমার উদয়াদিত্য, সেনানায়ক প্রতাপসিংহ প্রমুখ বীরগণ বহুল সৈন্য লইয়া মানসিংহকে আক্রমণ করিলেন। বসন্তপুর নামক স্থানে যুদ্ধের আয়োজন হইল। উভয়পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

ধূধূ ধূধূধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভমভম দামামা দমদম
ঝনন্ন ঝমঝম ঝাঁজে॥
কত নিশান ফর ফর নিনাদ ধর ধর
কামান গর গর গাজে॥
জুঝে প্রতাপ আদিত্য জুঝে প্রতাপ আদিত্য।
ভাবিয়া অসার ডাকে মার মার সংসার সব অনিত্য॥

বাগ্মীবর শঙ্কর সৈন্যদিগকে ওজস্বিনী বক্তৃতায় উদ্দীপ্ত করিলেন। বঙ্গীয় সৈন্যদল দ্বিগুণিত উৎসাহে মানসিংহের সেনা আক্রমণ করিল। সমস্ত দিন যুদ্ধ চলিল। বেলা অবসানের সময় শঙ্করের সেনাদল ভীমপরাক্রমে মোগল সেনাদলের ভিতর প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিল। দিবসব্যাপী সমর শ্রমে পরিশ্রান্ত মোগলসেনা পিছু হঠিতে লাগিল। মানসিংহ অনন্যোপায় হইয়া পাঁচ ক্রোশ পশ্চাতে সরিয়া যাইয়া সে রাত্রির মত শ্রান্তিদূর করিলেন।

পরের দিন ভোর হইতে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এদিনের যুদ্ধ আরও ভীষণতর। মানসিংহ সমারোহের সহিত ভগবতীর পূজা করিয়া নিজ সেনাদলের মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, দেবী প্রতাপের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মানসিংহের পক্ষাবলম্বন করিয়াছেন। অদ্য মানসিংহের জয় অবশ্যম্ভাবী। মানসিংহের সেনাদল এই বিশ্বাসে নববলে বলীয়ান্ হইয়া বঙ্গসেনা আক্রমণ করিল। কুঞ্চিত-কেশ হাবসী, জোয়ান রাজপুত, অতিকায় মোগল— সকলেই অতি

পরাক্রমের সহিত লড়াই করিতে লাগিল। সেনাপতি সূর্য্যকান্ত ইহাদিগকে অনন্যসাধারণ বীরত্বের সহিত ভেদ করিয়া ছিন্নভিন্ন করিতে লাগিলেন। সূর্য্যকান্ত আপনাকে মোগল পরিবেষ্টিত দেখিয়া মোরিয়া হইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে বীরগতি প্রাপ্ত হইলেন। সূর্য্যকান্তের পতনে উনিশ বছরের তরুণ বীর উদয়াদিত্য ভীমবিক্রমে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিতে করিতে মানসিংহের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে বিপক্ষের নিক্ষিপ্ত ভীষণ গোলা বীরবর মদনমল্লের বক্ষঃস্থলে পতিত হইলে তাঁহাকেও সূর্য্যকান্তের পথ অনুসরণ করিতে হইল। উপরি উপরি দুইজন সেনাপতির পতনে বঙ্গীয় সেনা হতবল হইয়া পড়ে। এই সময়ে ফিরিঙ্গি সেনাপতি রডা তাহার স্বদেশবাসীদিগকে উত্তেজিত করিয়া প্রবল ভাবে মোগল সেনা আক্রমণ করিয়া অসংখ্য শত্রু ধ্বংস করিয়া রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন।

এদিকে ধীরে ধীরে যশোর দুর্গে দুর্ভিক্ষ আসিয়া দেখা দিয়াছে, সেই সময় কতিপয় বিশ্বাসঘাতক মানসিংহের নিকট দুর্গের আটঘাট বলিয়া দিল। প্রতাপ এরূপ অবস্থায় যশোরে থাকা অবিধেয় মনে করিয়া ধূমঘাটে চলিয়া গেলেন। তথাপি যশোর দুর্গ অধিকার করিতে মানসিংহকে রীতিমত ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। বাঙালীদের অসাধারণ বীরত্বে ও ক্লেশ-সহিষ্ণুতায় কাবুলবিজয়ী মানসিংহও বিস্ময়ান্বিত হইয়াছিলেন।

যশোর দুর্গ অধিকারের পর প্রতাপও হতবল হইয়াছিলেন। তিনি মানসিংহের সহিত এক সম্মানজনক সন্ধি করিলেন। এই

সন্ধির সর্ত্তে প্রতাপাদিত্যের সকল অধিকারই অব্যাহত রহিল। শুধু নিজ নামে মুদ্রা প্রচারের অধিকার তাঁহার রহিত হইল।

কিন্তু এভাব বেশীদিন রহিল না। মানসিংহের পর জাহাঙ্গীর, ইসলাম খাঁকে বাঙ্‌লার শাসনভার দিয়া পাঠাইলেন। মহারাজ মানসিংহের উদারতা ইসলাম খাঁর ছিল না। ইস্‌লাম খাঁ সুবেদার হইয়া আসিলে প্রতাপের কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রামাদিত্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। পরে প্রতাপও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। ইস্‌লাম খাঁ তাঁহাকে ভাটির জমিদারদের বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগদানের কথা বলিলেন। ইসলাম খাঁর এই অন্যায় আদেশ মানিয়া চলা প্রতাপের পক্ষে অসম্ভব ছিল। কাজেই কিছুদিনের মধ্যেই আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ইসলাম খাঁ, সেনাপতি ইনায়েত খাঁ ও মির্জ্জা সহনকে প্রতাপের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। প্রতাপ তখন বৃদ্ধ। কিন্তু দেশ-জননীর স্বাধীনতা রক্ষার্থ তাঁহার বৃদ্ধ দেহে যেন যৌবনের বান ডাকিল। তিনি বহুসৈন্য পরিচালনা করিয়া মোগল সেনা আক্রমণ করিলেন। বঙ্গীয় সেনাদলের জয়োল্লাসে মোগল সৈন্য মথিত হইতে লাগিল। এই সময়ে প্রতাপের অন্যতম সেনানায়ক পাঠান সেনানী কমল খোজা মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার পরিচালিত বাহিনী নিস্তেজ হইয়া পড়িল। এদিকে উদয়াদিত্যের সেনাদলও পশ্চাৎপদ হইতে লাগিল। মোগলের জয়োল্লাসে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল। প্রতাপ প্রমাদ গণিলেন। একে একে তাঁহার সহায় সম্পদস্বরূপ পরাক্রমশালী সহচরগণ রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিতে

লাগিল। প্রতাপের আশা-ভরসা যেন নির্ম্মূল হইল। অবশেষে প্রতাপ সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। ইনায়েৎ খাঁ বলিলেন, সন্ধি ইস্‌লাম খাঁর সহিত ঢাকাতে হওয়াই সমীচীন। অগত্যা প্রতাপ ঢাকা যাওয়াই স্থির করিলেন। কিন্তু ইস্‌লাম খাঁ তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন না, তাঁহাকে বন্দী করিয়া কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। এ-সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছিলে রাজকুমার উদয়াদিত্য বীর বিক্রমে মোগলের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সেই দীর্ঘ দিনের লড়াইয়ের হতাবশিষ্ট সেনা লইয়া আর কতদিন লড়াই চলে? যুদ্ধ করিতে করিতে উদয়াদিত্য সমর-ক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন। তাঁহার আত্মত্যাগে প্রতাপ-মহিষী শরৎকুমারী পৌরনারী সহ রাজপুরী ত্যাগ করিয়া নৌকাযোগে বাহির হইয়া পড়িলেন। কিন্তু চারিদিকেই যে মোগলের অগণিত সেনা ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছে, আর পথ নাই। তারপর যাহা ঘটিল তাহা বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী—অতি বড় নিষ্ঠুর পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়। আর কোন উপায় না পাইয়া মহিষী সেই নদীতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। আজও লোকে সেস্থান দেখাইয়া চোখের জল ফেলে। শরৎখানার দহ নামে উহা অভিহিত।

এদিকে কিছুদিন পর ইস্‌লাম খাঁ বন্দী প্রতাপকে দিল্লী পাঠাইয়া দিলেন। দিল্লীগমনকালে পথিমধ্যেই বারাণসীতে মহারাজ প্রতাপাদিত্য অমর ধামে প্রয়াণ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্‌লার স্বাধীনতার শেষ শিখাটি বাঙালীর তপ্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাসে চিরতরে নির্ব্বাপিত হইল।

চাঁদ রায় ও কেদার রায়

ষোড়শ শতাব্দী বাঙ্‌লার এক গৌরব যুগ। এই সময় বাঙ্‌লার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত দেশময় প্রতাপ, কেদার, রামচন্দ্র, লক্ষ্মণমাণিক্য, মুকুন্দরায়, হাম্বীর প্রভৃতি বঙ্গবীরগণের অভ্যুদয়ে বিদেশীর শাসন-বাঁধন ছিন্নপ্রায় হইয়াছিল।

এই পুণ্যযুগে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিক্রমপুরে চাঁদ রায় ও কেদার রায় রাজত্ব করেন। ইঁহারা দুই ভাই। ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ নিমু রায় কর্ণাট হইতে আসিয়া ফুলবাড়িয়া গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করেন। শ্রীপুর ইঁহাদিগের রাজধানী ছিল। শ্রীপুর তখন কালীগঙ্গার তীরে এক প্রসিদ্ধ নগর ও বন্দর ছিল। সেই শ্রীপুর আজ কীর্ত্তিনাশার প্রচণ্ড তরঙ্গাঘাতে নদীগর্ভে নিমগ্ন হইয়াছে। রায় রাজগণের কীর্ত্তি নাশ করিয়া পদ্মা কীর্ত্তিনাশা নাম লইয়া এখনও প্রবাহিত হইতেছে—এইটুকু মাত্র শ্রীপুরের স্মৃতি নদীর নামের সহিত বিজড়িত রহিয়াছে।

বিক্রমপুর প্রদেশের বিশেষত্ব এই যে ইহা অসংখ্য নদনদী দ্বারা বিভক্ত এবং বহু চর ও দ্বীপে পূর্ণ। ইহাতে অধিবাসিগণ শত্রুকে হঠাৎ অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত করিতে পারে এবং অনায়াসে অল্প সময়ে সুযোগ বুঝিয়া পলায়ন করিতেও

পারে। বিশেষতঃ এই অঞ্চলের নৌ-সেনাগণের সহিত সংঘর্ষে মোগল অশ্বারোহী কোন রকমেই আঁটিয়া উঠিতে পারিত না।

বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অবস্থিত সন্দ্বীপ তখন একটী প্রসিদ্ধ স্থান। উহা কেদার রায়ের অধিকারে ছিল। কিন্তু মোগলেরা উহা অধিকার করিতে চেষ্টা করে। কেদার রায় বহু সংখ্যক রণতরী ও নৌসেনাসহ স্বীয় কর্ম্মচারী ফিরিঙ্গি সেনাপতি কার্ভালোর সমভিব্যাহারে সন্দ্বীপ আক্রমণ করিলেন। মোগলেরাও কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নয়। ভীষণ যুদ্ধ চলিল। অবশেষে মোগলসেনা পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করিয়া সন্দ্বীপের শাসনভার কার্ভালোর হস্তে ন্যস্ত করিয়া কেদার শ্রীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

কেদার শ্রীপুরে ফিরিয়া আসিলে আরাকানের মগরাজা আবার সন্দ্বীপ অধিকারের জন্য আক্রমণ করেন। কেদার কার্ভালোর সাহায্যার্থ কামান বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধোপকরণসহ একশত কোষনৌকা ও বাঙালী নৌসেনা সন্দ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন। ওদিকে আরাকান-রাজ দেড় শত রণতরী প্রেরণ করেন। ইহার মধ্যে কতকগুলি কামান বন্দুক শোভিত বড় বড় কার্ত্তুস ছিল। ১৬০২ খৃঃ অব্দে ১০ই নবেম্বর রাত্রে সাগরের বুকে বাঙালী, পর্ত্তুগীজ ও মগে ভীষণ যুদ্ধ চলিল। বাঙালীদের অধিকাংশ রণতরী ছিল সাধারণ জেলিয়া। কিন্তু রাত্রি ভোর হইবার পূর্ব্বেই মগ-রণবহর সমস্ত বিধ্বস্ত হইয়া যায়—মাত্র একখানি বার্কেস পলায়ন করিতে পারে। মগরাজ এই যুদ্ধে বহুল পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু এ পক্ষের বরং



মোগলের সহিত কেদার রায়ের বাঙালী সেনাদের জলযুদ্ধ

লাভই হইয়াছিল। ইহারা বহু তীর, বন্দুক ও বারটি কামান পাইয়াছিলেন।

এই পরাজয়ের বার্ত্তা শুনিয়া আরাকান-রাজ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। তিনি এই অপমানের একটা ভাল রকম প্রতিশোধ লইবার জন্য বিপুল রণবাহিনী সন্দ্বীপের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। এক হাজার রণতরী প্রেরিত হইল—ঝাণ্ডার, বড় কার্ত্তুস ও বহু কোষ নৌকা আসিয়া সন্দ্বীপ আক্রমণ করিল। এই সময়ে মোগল সেনাপতি মানসিংহ বাঙ্‌লার স্বাধীন রাজাদের স্বাধীনতা হরণ করিতে বাঙ্‌লার শ্যামল প্রাঙ্গণে আসিয়া হানা দিয়াছেন। কাজেই কেদার, কার্ভালোর বড় বিশেষ সাহায্য করিতে পারিলেন না। যাহা হউক কার্ভালো সামান্য বাঙালী ও পর্ত্তুগীজ সেনা লইয়া মাত্র পঞ্চাশ খানা জেলিয়া, চারি খানি কার্ত্তুস্‌ ও একখানি রণতরী সহ মগরাজের বিপুল বাহিনী প্রতিরোধে অগ্রসর হইলেন। বেলা এগারটা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ভীষণ জলযুদ্ধ হইল। প্রায় দুই হাজার মগ মারা পড়িল, ১৩০ খানি রণতরী ভস্মীভূত হইল। কার্ভালোর বিজয়ী নাম সারা বাঙ্‌লায় ছড়াইয়া পড়িল।

জয় লাভ করিলেও কার্ভালোর সমস্ত জাহাজ অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল এবং যুদ্ধোপকরণও নিঃশেষিত হইয়াছিল। জাহাজ মেরামতের জন্য কার্ভালো শ্রীপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

এই সময়ে মানসিংহ বাঙ্‌লায় আসিয়া মন্দা রায় নামক একজন বাঙালী সেনাপতিকে একশত রণতরী ও একদল সাহসী ও নির্ভীক মোগল সৈন্যসহ শ্রীপুরাভিমুখে পাঠাইয়া দিলেন। মন্দা রায়

মোগল বাহিনী সহ মেঘনার উপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র কেদার রায়ও বাঙালী সেনাসহ তাঁহার প্রতিরোধ করিতে দাঁড়াইলেন। কার্ভালো নৌসেনা পরিচালনা করিতে লাগিলেন। বাঙালী ও মোগলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল, মেঘনার নীল জল রক্তবর্ণ হইল, কামানের গর্জ্জনে ও ধূমে গগন পূরিত হইল। কেদার রায়ের সেনাদলের পরাক্রমে মোগল সেনাপতি মন্দা রায় পরাজিত ও নিহত হইলেন। অধিকাংশ মোগলসেনা লড়াইতে প্রাণ হারাইল, সামান্য অবশিষ্ট পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইতে পারিল।

মানসিংহ এই পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া উঠিলেন। তিনি বিশাল বাহিনী সহ কেদারের রাজ্য চড়াও করিলেন। কেদার বৃথা লোকক্ষয় না করিয়া মানসিংহের সহিত সন্ধি করিলেন।

মানসিংহ ফিরিয়া গেলে কেদার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মোগল-দরবারে কর পাঠাইলেন না। তাগিদ আসিল, অগ্রাহ্য করিলেন। মানসিংহ নীরবে এ অপমান সহ্য করিবার লোক নহেন, কেদার ইহা ভাল করিয়াই জানিতেন। তাই তিনিও যুদ্ধের আয়োজন করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মানসিংহ সেনাপতি কিলমককে শ্রীপুর জয়ে প্রেরণ করিলেন।

কিলমক প্রথমে শ্রীনগর নামক কেদারের রাজ্যভুক্ত সমৃদ্ধ নগরের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কেদার বঙ্গবাহিনী সহ ভীষণভাবে মোগল সেনার উপর পতিত হইয়া উহাদিগকে ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। কালীগঙ্গার বক্ষ কামানের

গর্জ্জনে কাঁপিয়া উঠিল। মোগলগণ কিছুতেই বাঙালীদের সহিত আঁটিয়া উঠিতে পারিল না। তাহাদিগকে কেদারের সেনাদল ঘিরিয়া ফেলিল, কিলমকও ইহাদের সহিত বন্দী হইলেন। কেদার রায় সসৈন্য কিলমককে শ্রীনগরে বন্দী করিয়া রাখিলেন।

কিলমকের দুর্দ্দশার কাহিনী শুনিয়া মানসিংহ নিজেই বিপুল বাহিনী সহ কেদারকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য বিক্রমপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবির স্থাপন করিয়া মানসিংহ অসি-শৃঙ্খল ও নিম্নলিখিত লিপি সহ এক দূত কেদারের সভায় প্রেরণ করেন।—

'ত্রিপুর মঘ-বাঙ্গালী-কাক-কুলী-চাকুলী
সকল পুরুষমেতৎ ভাগ যাও পলায়ী॥
হয়গজনর-নৌকা-কম্পিত বঙ্গভূমি।
বিষম-সমরসিংহো মানসিংহ প্রয়াতি॥'

কেদার রায় মানসিংহের এই লিপি, শৃঙ্খল ও অসি দেখিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। কেদার অসিগ্রহণ করিলে তাঁহারই আদেশে পত্রনবিশ বিশ্বনাথ সেন এই উত্তর লিখিয়া দিলেন।—

'ভিনত্তি নিত্যং করিরাজ কুম্ভং
বিভর্ত্তিবেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥'

মানসিংহ পত্রের উত্তরে আরও আগুন হইয়া উঠিলেন। কালীগঙ্গার তীরে তীরে শ্রীনগরে আবার ভীষণ যুদ্ধ বাঁধিয়া গেল। কেদার পাঁচ শত রণতরী ও বহু পদাতিক ও অশ্বারোহী সেনা সহ মোগল সেনা আক্রমণ করিলেন। অগণিত মোগল সেনা দলে দলে বঙ্গসেনা আক্রমণ করিতে লাগিল। জলে স্থলে সর্ব্বত্র ক্রমাগত সাত দিন ধরিয়া ভীষণ যুদ্ধ চলিল। কালীগঙ্গার নীল জল রক্তে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধে মধু রায় প্রমুখ বঙ্গ-সেনানীগণ প্রবল বিক্রমে মোগল সেনা বিধ্বস্ত করিলেন। কিন্তু অবশেষে কেদার গোলাঘাতে ভীষণ ভাবে আহত হইয়া পড়িলেন। বিক্রমপুরের গৌরব-রবি চিরতরে আঁখি মুদিল। আহত কেদারকে বন্দী করিয়া মানসিংহের নিকট নীত হওয়ার অল্পকাল পরেই তিনি প্রাণত্যাগ করেন।

বঙ্গ-বীরাঙ্গনা "রায় বাঘিনী"

'রায় বাঘিনী' নামটি বাঙ্‌লার মেয়ে-পুরুষ অনেকের নিকটই পরিচিত, অপরিচিত শুধু তাঁহার জীবন-কাহিনী। হতভাগ্য আমরা, তাই উদ্ধত প্রকৃতির নারীকেই আজ নিন্দাচ্ছলে 'রায় বাঘিনী' বলিয়া আখ্যাত করিয়া সেই বঙ্গ-বীরাঙ্গনার বীরত্বের এমনতর করিয়াই সম্মান করিতে শিখিয়াছি! এই মহীয়সী মহিলার শৌর্য্য-বীর্য্য একদিন বাঙ্‌লা ও উড়িষ্যার পাঠান শক্তিকেও হতমান করিয়াছিল।

'রায় বাঘিনী' একটি খেতাব। সে প্রায় পাঁচ শ' বৎসর আগেকার কথা। ষোড়শ শতাব্দীতে বাদসাহ আকবর দিল্লীর সিংহাসনে মোগল শাসনের ভিত্তি দৃঢ় করিয়াছেন। বাঙ্‌লায় তখনও মোগল-পাঠানের যুদ্ধের আগুণ থাকিয়া থাকিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। এই সময়ে আমরা পশ্চিম বাঙ্‌লায় এই বীর রমণীর অপূর্ব্ব শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয় পাই। সম্রাট্ আকবর এই বীরাঙ্গনার বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রভূত উপঢৌকন ও 'রায় বাঘিনী' উপাধিটি দিয়াছিলেন।

রায় বাঘিনীর আসল নাম রাণী ভবশংকরী। ভবশঙ্করীর

বাবা দীননাথ চৌধুরী পেঁড়োর গড়ের নিকটেই বাস করিতেন এবং পেঁড়োর গড়ের দুর্গাধিপের অধীন একজন সম্ভ্রান্ত সর্দ্দার ছিলেন। দীননাথ অস্ত্রনৈপুণ্যে বঙ্গবিখ্যাত ছিলেন এবং সহস্রাধিক সৈন্যের পরিচালক ছিলেন বলিয়া রাজ্যমধ্যে একজন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন।

ভবশঙ্করী বাপের একমাত্র মাতৃহীনা কন্যা। দীননাথ কন্যাটিকে একাকী রাখিয়া এক পা-ও নড়িতেন না। ভবশঙ্করী সর্ব্বদা বাপের সাথে সাথে থাকিয়া তলোয়ার ভাজিতেন, বর্শা চালাইতেন, তীর ছুঁড়িতেন, বন্দুক ছাড়িতেন। ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সারাদিন ঘুরিয়া ঘুরিয়া কোথায় হরিণ, কোথায় খরগোস, কোথায় পাখী, এই সব শীকার করিয়া বেড়াইতেন। সামরিক ক্রীড়া-কৌশল-অভ্যাস যেন ভবশঙ্করীর একটা প্রাক্তন সংস্কার ছিল। এইরূপে যৌবনের প্রারম্ভেই অনায়াসে পিতার অস্ত্রনৈপুণ্য ভবশঙ্করী আয়ত্ত করিয়া লইলেন।

এই পেঁড়োর গড় ভুরস্বুট (ভুরিশ্রেষ্ঠ) রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই সময়ে ভুরস্বুট রাজ্যে মহারাজ রুদ্রনারায়ণ রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজধানী ছিল গড় ভবানীপুর।

রুদ্রনারায়ণের সহিত ভবশঙ্করীর বিবাহ হয়। বিবাহের পর রাণী ভবশঙ্করী অসীম উৎসাহে রাজ্যের নানাবিধ সংস্কার কার্য্য আরম্ভ করিলেন। রুদ্রনারায়ণ নিজেও বীরপুরুষ ছিলেন, এক্ষণে উপযুক্ত পত্নীর উৎসাহে ও সহায়তায় রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নপর হইলেন। কিন্তু এই বীর-দম্পতির ভাগ্যে

দাম্পত্য জীবনের সুখভোগ অধিক দিন ঘটে নাই। বিবাহের কয়েক বৎসর পরেই রুদ্রনারায়ণ পরলোক গমন করেন।

এই সময়ে বঙ্গদেশে পাঠানের রাজত্ব নিশ্চিহ্ন করিয়া দিবার জন্য মোগল-সম্রাট্ আকবর বদ্ধপরিকর ছিলেন। মহারাজ রুদ্রনারায়ণও মোগলের সহিত সখ্য স্থাপন করিয়া পাঠান সর্দ্দার দায়ুদখাঁ ও কতলুখাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছেন। রুদ্রনারায়ণের মৃত্যু হইলে ভবশঙ্করী শিশু পুত্রটি লইয়া বড়ই মুস্কিলে পড়িলেন। তখন ওসমান পাঠান দলের সর্দ্দার। ওসমান দেখিলেন মস্ত সুযোগ। রাণী শোকে কাতর হইয়া সতত পূজার্চ্চনায় রত, রাজ্য বিশৃঙ্খল। এই ত প্রতিশোধ লইবার অবসর।

স্বামীর মৃত্যুর পর রাণী কাটশাকড়া শিবমন্দিরে বাস করিতেছেন। একদিন রাত্রিতে ওসমান কয়েকজন সঙ্গীসহ সন্ন্যাসীর বেশে আসিয়া শিবমন্দির আক্রমণ করিলেন। রাণীর অঙ্গরক্ষিণীগণ তখনও তলোয়ার হাতে পাহাড়া দিতেছিল। রাণীর বীরমূর্ত্তি ও সশস্ত্র অঙ্গরক্ষিণীদের দেখিয়া ওসমান ফিরিয়া গেলেন।

ওসমান আবার চেষ্টা করিলেন। এবার সদল বলে আক্রমণ করিলেন। বাশুরীর ভবানী মন্দিরে সেদিন রাত্রিতে রাণী ভবশঙ্করীর তন্ত্রে অভিষিক্ত হইবার কথা। সেই রাত্রিতে সুযোগ বুঝিয়া ওসমান বাশুরী অভিমুখে ছুটিলেন।

রাণীর অভিষেক শেষ হইয়াছে। এমন সময়ে সেই নিশীথকালে

রাজধানী হইতে এক দূত আসিয়া বলিল, পাঠানগণ আক্রমণ করিতে আসিতেছে, প্রস্তুত হউন। রাণীর সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত তখন মোটেই নাই, জনকয়েক শরীর-রক্ষী মাত্র। অমনি ছাউনাপুরের দুর্গাধিপের নিকট সংবাদ গেল। ছাউনাপুর দুর্গাধিপ সসৈন্যে আসিয়া রাণীমা'র সহায়তায় দাঁড়াইলেন। তখন রাণী ওজস্বিনী ভাষায় সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া তুলিলেন। তৎপর রণহস্তীতে আরোহণ করিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। সৈন্যগণ প্রস্তুত হইল। এমন সময়ে দূরে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শুনিয়া রাণী সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাগ্রে বন্দুক ছুঁড়িলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে চারিশত বন্দুকের আওয়াজে সেই বিশাল মাঠ কাঁপিয়া উঠিল।

ওসমান অবাক্ হইলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করিয়া রাণীকে ছিনাইয়া লইবেন। কিন্তু এ যে রীতিমত যুদ্ধ। যাহা হউক পাঠান বীর দমিবার নন। তিনিও তুড়ি বাজাইলেন। ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

রাণী বিশাল বর্শা হস্তে প্রবলভাবে পাঠান দল আক্রমণ করিলেন। রাণীর সৈন্যগণ দ্বিগুণিত উৎসাহে মুসলমান সেনার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। ওসমানও বীরদর্পে যুদ্ধ করিয়া রাণীর দিকে ছুটিয়া চলিলেন। কিন্তু তখন ওসমানের সৈন্য প্রায় বিধ্বস্ত। কতক্ষণ আর লড়াই করেন? অশ্বটিও যখন গেল, ওসমান তখন রণভূমি পরিত্যাগ করিয়া ফকিরের বেশে উড়িষ্যায় ফিরিয়া গেলেন। এই যুদ্ধক্ষেত্র আজিও

"রায় বাঘিনীর পড়া" নামে পরিচিত। তারকেশ্বরের প্রায় ৪।৫ মাইল পশ্চিমে ইহা অবস্থিত। সম্রাট্ আকবর এই যুদ্ধে রাণীর বীরত্বের কথা শুনিয়া মহারাজ মানসিংহকে ভুরস্যুটে পাঠাইয়া দেন এবং রাণীকে বহু মণিমাণিক্য উপহারসহ 'রায় বাঘিনী' উপাধি প্রদান করেন।

লক্ষ্মণমাণিক্য

"বৎস, চিন্তা করিও না। প্রভাতে এই স্থানেই কূল পাইবে। কূলে উঠিয়া মাটি খনন করিলে আমার এক পাষাণময়ী বারাহী মূর্ত্তি পাইবে। ঐ দেবমূর্ত্তি এইস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিও। তুমি এখানকার রাজা হইবে।" রাত্রি শেষের তন্দ্রার ঘোরে দেবাদিষ্ট এই স্বপ্ন দেখিয়া বিশ্বম্ভর শূর জাগরিত হইয়া সকলকে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বলিলেন। ভোর হইলে সকলেই বিস্ময়ে দেখিলেন, যেখানে নিশীথ রাত্রিতেও অন্তবিহীন জলরাশি থৈ থৈ করিতেছিল, সেখানে এক প্রকাণ্ড বালুকাময় চরভূমি ধূ ধূ করিতেছে। বিশ্বম্ভর শূর মিথিলার কায়স্থ-তিলক আদিশূরের বংশীয়, সপরিবারে নৌকাযোগে চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শনে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে মেঘনার অকূল জলে রাত্রিকালে দিক্ হারাইয়া দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইলেন।

তারপর দেবীর নির্দ্দেশ মত মাটী খুঁড়িলে এক পাষাণময়ী মূর্ত্তি বাহির হইল। ঠিক হইল, সেই দিনই মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন। কিন্তু সেদিন একবারও রৌদ্র উঠিল না—আকাশ কুয়াসাচ্ছন্ন, চারিদিক অন্ধকার। যাহা হোক, মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। পরদিন যখন সূর্য্যের আলোকে কুয়াসা দূর হইল,

সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, দেবীমূর্ত্তি পূর্ব্বদিকে মুখ করিয়া বসান হইয়াছে। হিন্দুর বিগ্রহ পশ্চিম বা দক্ষিণ দিকে মুখ করিয়াই স্থাপিত হইয়া থাকে। এত বড় একটা ভুল হওয়াতে সকলেই বলিয়া উঠিলেন—ভুল হুয়া। সেই হইতে ঐ স্থানের নাম হইল ভুলুয়া। ভুলুয়ার অধিকাংশই এখন নোয়াখালী জেলায় অবস্থিত।

এই বিশ্বম্ভর শূরের বংশেই মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্য জন্মগ্রহণ করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে বার জন খ্যাতনামা ভূম্যধিকারী ছিলেন, মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্য ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম। ইঁহারা চলিত কথায় 'বার ভূঞা' নামে পরিচিত। ইঁহাদের শৌর্য্য ও বীরত্ব বাঙ্লার গর্ব্বের কথা।

মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্য বীর ছিলেন, জ্ঞানী-পণ্ডিত ছিলেন, সমাজ-সংস্কারক ছিলেন।

মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্য বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং অবশেষে নিজের সমাজের 'গোষ্ঠীপতি' হন। প্রথমে তাঁহাকে বড়ই অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু আপনার স্বাভাবিক বিষয়-বুদ্ধি ও বিচক্ষণতায় তিনি সমাজের শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিয়াছিলেন। মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্যের মেয়ের বিবাহে এক গোলযোগ উপস্থিত হয়। কায়স্থ-সমাজ তাঁহার জামাতাকে 'এক ঘরে' করিয়া রাখেন। এই সময়ে বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে চারিজন গোষ্ঠীপতি ছিলেন—চন্দ্রদ্বীপ সমাজের (বরিশালের) রাজা রামচন্দ্র রায়, যশোহর

সমাজের মহারাজ প্রতাপাদিত্য, ফতেয়াবাদ সমাজের (ফরিদপুরের) রাজা মুকুন্দ রায় এবং বিক্রমপুর সমাজের মহারাজ কেদার রায়। ইঁহারা সকলেই মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্যকে তাঁহার সমাজের গোষ্ঠীপতি বলিয়াই স্বীকার পাইলে মহারাজের বিপক্ষ দলই সমাজ-চ্যুত হইয়া পড়িল। মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্য নিজের সমাজকে উন্নত ও শক্তিশালী করিবার জন্য তাঁহার রাজ্যে বহু সম্মানিত ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্য আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি যে সমাজ গড়িয়াছিলেন উহা সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার কার্য্যকুশলতার আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাই।

মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্য নিজে খুব পরোপকারী, প্রজাবৎসল ও বিদ্বান্ ছিলেন। তাঁহার রচিত বিজয় নাটক (সংস্কৃত) খুবই সুন্দর ও সুপাঠ্য। উহাতে তাঁহার সাহিত্য-জ্ঞান ও রচনা-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এই নাটকখামি অর্জ্জুন কর্ত্তৃক কর্ণবধের বিবরণ লইয়া লেখা হইয়াছে।

লক্ষ্মণ-মাণিক্যের রাজত্বকালে আরাকাণের মগগণ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠে। উহারা বঙ্গোপসাগরের তীরবর্ত্তী স্থানগুলি লুঠতরাজ করিতে আরম্ভ করে। ইহাতে ঐ সমস্ত স্থানের হিন্দুদের জীবন ও ধনসম্পত্তি বিপন্ন হইয়া পড়ে, এবং বহু স্থান জনশূন্য হইয়া যায়।

সন্দ্বীপ আক্রমণ করিয়া মগেরা ভুলুয়া আক্রমণ করে। লক্ষ্মণ-মাণিক্য দুইবার উহাদিগকে পরাজিত করিয়া বিতারিত করিলেন, কিন্তু পরিশেষে নিজের কনিষ্ঠ ভাই রাজ্যলোভে

বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তাঁহাকে পরাজিত ও স্বরাজ্য হইতে বিতারিত হইতে হয়। মগেরা ভুলুয়ার অন্তর্গত হুদা ভুলুয়া নামক স্থানে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করে, উহার নাম হয় 'সহর কস্‌বা'। আর কোন উপায় না পাইয়া লক্ষ্মণ-মাণিক্য ঈশাখাঁর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। ঈশাখাঁ সোনারগাঁর পাঠান অধিপতি। তিনি তখন মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। সম্রাট্ আকবর শাহ্ দিল্লীর বাদশাহ্। তাঁহার নিকট এ সংবাদ পৌঁছিলে তিনি বাঙ্‌লার মোগল সেনাপতিকে লিখিলেন, মগদের বিরুদ্ধে মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্যকে সাহায্য করিতে। যদিও লক্ষ্মণ-মাণিক্য প্রমুখ বাঙ্‌লার বারভূঞার দল সম্রাট্ আকবরের বিরুদ্ধাচরণই করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি সর্ব্বসাধারণের শত্রু আরাকাণীদের দমনের জন্য মোগল সৈন্য প্রেরিত হইল। এই মিলিত সেনাদলের নিকট আরাকাণী মগের দল পরাজিত হইল। 'সহর কস্‌বা' বিধ্বস্ত হইল, মগেরা সন্দ্বীপে পলাইয়া প্রাণে বাঁচিল। মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্য আবার ভুলুয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। শোনা যায়, যুদ্ধকালে মহারাজ নাকি এক মণ ওজনের কবচ ধারণ করিতেন। মগদের সহিত ভীষণ লড়াইয়ে বাঙালীর বীরত্বের কথা শুনিলে আজও আমাদের শিরায় শিরায় রক্তবিন্দুগুলি নাচিয়া মাতিয়া উঠে।

মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্য রাজা হইয়া যুদ্ধে যাহারা সাহায্য করিয়াছে তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিলেন। আজও তাহাদের বংশধরগণ লক্ষ্মণ-মাণিক্যের নিষ্কর জমি ভোগ করিতেছেন।

কিন্তু মহারাজ বেশীদিন শান্তিতে থাকিতে পারিলেন না। আবার ১৬১০ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপে দুর্দ্ধর্ষ মগদের সঙ্গে মোগলের সহযোগে বার ভূঞাদের প্রলয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধে অসীম বীরত্ব দেখাইয়া বাঙালী-বীর মহারাজ লক্ষ্মণ-মাণিক্য জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত লড়াই করিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

মুকুন্দ রায়

মুকুন্দ রায় জন্মভূমির স্বাধীনতা ও স্বাধিকার রক্ষার জন্য আমরণ মোগলের সহিত যুদ্ধ করিয়াই গিয়াছেন, তবু দাসত্বের ডোর গলায় পরেন নাই, প্রাণ দিয়াছিলেন, মান দেন নাই। মুকুন্দ রায় ফতেয়াবাদের অন্তর্গত ভূষণার রাজা ছিলেন। ফতেয়াবাদ এখন ফরিদপুর জেলায় অবস্থিত, মধুমতী নদীর পূর্ব্ব পারে রাজধানী ভূষণা। আজ সেই সমৃদ্ধিশালী রাজনগরী একটি ছোট গ্রাম মাত্র। ভূষণার সেই দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

বাঙ্‌লা যখন মোগলের বাহুবলে পাঠানদের হাতছাড়া হইয়া গেল, সেই সময়ে ফতেয়াবাদের অধিপতি ছিলেন পাঠান সর্দ্দার মোরাদ খাঁ। আর মুকুন্দ রায় ছিলেন সেখানকার একজন সামান্য জমিদার। মুকুন্দ রায় ও মোরাদ খাঁর মধ্যে বিশেষ বন্ধুতা ছিল। পাঠান বাঙ্‌লা ছাড়িয়া গেলেও, মোরাদ বাঙ্‌লা ছাড়েন নাই। তিনি মোগলের পক্ষেই রহিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে বাঙ্‌লার মোগল শাসনকর্ত্তা হোসেন কুলিখাঁর মৃত্যু হইল। সুযোগ বুঝিয়া পাঠান-নায়ক কতুল খাঁ বাঙ্‌লায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন— উদ্দেশ্য ফতেয়াবাদ অধিকার করা। এদিকে মোরাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাঁহার নাবালক পুত্ত্রগণ বড়ই বিপদ্ গণিলেন। এই

সময় বীরশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ রায় বন্ধুর উপযুক্ত কাজ করিলেন। তিনি মোরাদের সেনাদলের সহিত নিজ সেনাদল মিলিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে নামিয়া পড়িলেন—আবার মোগল সেনাও সঙ্গে আসিয়া জুটিল—বাধ্য হইয়া পাঠান সেনা প্রাণ লইয়া পলাইল।

বাঙ্‌লার মোগল শাসনকর্ত্তা রাজা টোডরমল মুকুন্দের বীরত্বের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকেই ফতেয়াবাদের শাসন-কর্ত্তৃরূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। মুকুন্দও অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। তিনি মোরাদের পরিবারবর্গকে যথোচিত ভূ-সম্পত্তি প্রদান করিলেন। তাঁহার উদারতায় সকলেই মুগ্ধ হইল।

ইহার পর মহারাজ মানসিংহ যখন বাঙ্‌লার শাসনকর্ত্তা হইয়া আসেন তখনও মুকুন্দের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ। কিছুদিনের জন্য মানসিংহ যখন স্বদেশে চলিয়া যান সেই সময়ে বাঙ্‌লার শাসনকর্ত্তা হইলেন সায়দ খাঁ। সায়দ খাঁ মস্‌নদে বসিয়াই রাজা মুকুন্দকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার পদে একজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। এই বিপদেও মুকুন্দ রায় কিন্তু বুদ্ধি হারাইলেন না। এই সময়ে বাঙ্‌লার আকাশে বাতাসে মোগল-বাঁধন ছিন্ন করিবার মুক্তিমন্ত্র প্রচারিত হইতেছিল, মুকুন্দের কাণেও সে বাণী পৌঁছিয়া প্রাণে একটা কাঁপন আনিয়া দিল। মুকুন্দ মোগলের বিরুদ্ধে স্বাধিকার রক্ষার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ফতেয়াবাদের নূতন শাসনকর্ত্তার সহিত মুকুন্দের ভীষণ যুদ্ধ হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও বিচক্ষণ মুকুন্দের সাহসিক সেনাদলের সম্মুখে মোগল-সেনা দাঁড়াইতে পারিল না। শোনা যায়, শাসনকর্ত্তাটী মুকুন্দের

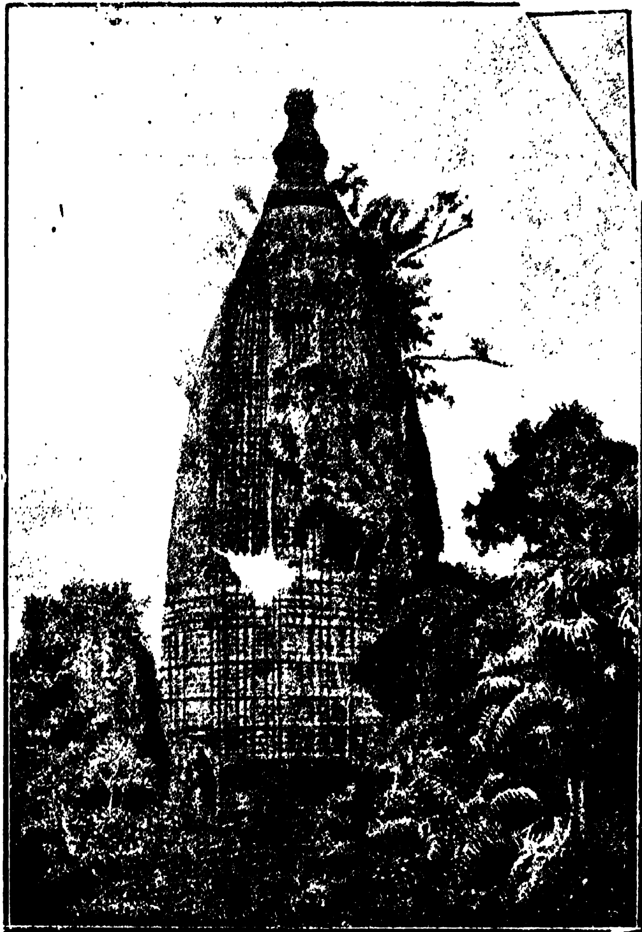
অসামান্য রূপলাবণ্যবতী কন্যার সতীত্ব নাশের চেষ্টা করাতে সেই তরুণীর অসির আঘাতেই নাকি তাহার মৃত্যু হয়।

এই পরাজয়ের কথা সায়দ খাঁর নিকট পেঁাছিলে তিনি রাগে জ্বলিয়া উঠিলেন। আবার ভীষণতর যুদ্ধের আয়োজন হইল, সারা বাঙ্‌লার বাদশাহী সেনা প্রতিশোধের আগুনে জ্বলিয়া ভূষণার দিকে ছুটিয়া আসিল। মাদারীপুরের অন্তর্গত ফতেজঙ্গপুরের মাঠে সায়দখাঁর সহিত মুকুন্দ রায়ের যুদ্ধ বাধিল। সে এক ভীষণ যুদ্ধ। মুকুন্দের মত বীর, স্বাধীনচেতা ও বিচক্ষণ সেকালে কমই ছিল। একবার যুদ্ধে নামিলে মুকুন্দ হঠিবার লোক ছিলেন না। তাঁহার সেই বীর বিক্রমে মোগলসেনা বিধ্বস্ত হইতে লাগিল, মোগলের মান-ইজ্জৎ বুঝি যায়! অবশেষে সেই বিশাল মোগল বাহিনীর সহিত মুকুন্দের ক্ষুদ্র সেনাদল আর পারিয়া উঠিল না। একে একে বীরগণ প্রাণ দিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ যুদ্ধ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিলেন। সেদিন এম্‌নি ভাবেই বাঙালী-বীরের হৃদয়-শোণিতে বাঙ্‌লার শ্যামল প্রান্তর রক্তায়িত হইত, ভীরুতার কলঙ্ক-কালিমা সে বীরত্বের ছায়াও স্পর্শ করিতে পারে নাই।

কন্দর্পনারায়ণ রায় ও রামচন্দ্র রায়

যাঁহার প্রতাপে একদিন বাঙ্লার পাঠানের সিংহাসনখানি হিন্দুর হাতে আসিয়াছিল সেই পরাক্রমশালী মহারাজ দনুজ-মর্দ্দনদেবের বংশের সহিতই ভূঞাশ্রেষ্ঠ মহারাজ কন্দর্পনারায়ণ সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ (বসুরায়) দৌহিত্র সূত্রে মহারাজ দনুজমর্দ্দন দেবের বংশের রাজসিংহাসন লাভ করেন। আজকাল আমরা যাহাকে বরিশাল জেলা বলি, আগেকার দিনে ইহারই নাম ছিল চন্দ্রদ্বীপ। কন্দর্পনারায়ণ চন্দ্রদ্বীপের রাজা ছিলেন, মাধবপাশা তাঁহাদের রাজধানী ছিল। আজও মাধব-পাশার সেই প্রাচীন রাজকীর্ত্তি সে যুগের ঐশ্বর্য্য ও শক্তিমত্তার কথাই জাগাইয়া দেয়। এই রায় রাজগণের প্রতিষ্ঠিত অনেক কীর্ত্তি-কাহিনী বরিশাল জেলার নানাস্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। ইঁহাদের বীরত্ব-গাথা আজও বরিশালবাসী ভুলিতে পারে নাই। বরিশালের প্রত্যেক মানুষটির ভিতর যেন ইহাঁদের বীরত্ব প্রভাব জীবন্ত রহিয়াছে।

কন্দর্পনারায়ণ বারভূঞার অলঙ্কার ছিলেন। তাঁহার ভয়ে মগ-ফিরিঙ্গি সন্ত্রস্ত ছিল। তাঁহার মত জলযোদ্ধা সেকালে বড় ছিল না।



রাজনাটীর মঠ

১৫৮৪ খৃষ্টাব্দে সন্দ্বীপের ভীষণ যুদ্ধে তিনি অশেষ বীরত্ব দেখান। তারপর সাহাবাজ খাঁর সহিত যখন মাসুম কাবুলীর যুদ্ধ বাধে সেই সময়ে কন্দর্পনারায়ণ নিজের সেনাদল লইয়া সাহাবাজ খাঁকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। হোসেনপুরে তিনি পাঠানদিগকে এমন নির্ম্মূল করিয়া মথিত করিয়াছিলেন যে আর কোনদিন তাহারা মাথা তুলিতে সাহস করে নাই। এই যুদ্ধে কন্দর্পনারায়ণের বীর নাম সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বারভূঞারা যখন একত্র মোগল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন, তাহার কিছুকাল পরেই কন্দর্পনারায়ণের মৃত্যু হয়।

পিতার মৃত্যুর পর রামচন্দ্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনিও নৌযুদ্ধে সুনিপুণ ছিলেন। রামচন্দ্র, মহারাজ প্রতাপাদিত্যের কন্যা ইন্দুমতী দেবীকে বিবাহ করেন। কোন কারণে প্রতাপাদিত্য জামাতার উপর ক্রুদ্ধ হন। রামচন্দ্রও ইন্দুমতীকে আর গৃহে আনিলেন না। অবশেষে মা ও শ্বাশুরীর অনুরোধে বধূকে স্বরাজ্যে আনয়ন করেন। রাজবধূ ইন্দুমতী চন্দ্রদ্বীপের যে স্থানে নৌকা হইতে প্রথম অবতরণ করেন, সেইস্থানে তাঁহার সম্মানার্থ একটি হাট বসান হয়। আজও লোকে উহাকে 'বৌঠাকুরাণীর হাট' বলিয়া থাকে।

রাজা সীতারাম রায়

বাঙ্‌লার নবাব তখন মুর্শিদকুলি খাঁ, হীনশক্তি বাহাদুর শাহ্‌ দিল্লীর বাদশাহ্‌। সেই সময়ে ভূষণার অপর পারে মধুমতী নদীর তীরে রাজা সীতারাম রায়ের রাজ্য ছিল।

রাজা সীতারামের স্বাধীন হিন্দুরাজ্য গঠনের সঙ্কল্প ছিল। সৈয়দ আবু তোরাব ছিলেন ভূষণার ফৌজদার। এই সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত করিতে যাইয়া আবু তোরাবের সঙ্গে রাজা সীতারামের সংঘর্ষ বাঁধিল। ছোট-খাট বিষয় লইয়া প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ, দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লাঠা-লাঠি পর্য্যন্ত হইয়া যাইত। সীতারাম দেখিলেন, এরূপ ভাবে বেশীদিন থাকা অসম্ভব। তিনি তখন বাদ্‌শাহের খাজানা বন্ধ করিয়া দিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন।

সীতারাম অতি সাধারণ অবস্থা হইতে ক্ষমতাশালী রাজা হইয়া উঠেন। সীতারামের বাবার নাম ছিল উদয়নারায়ণ এবং মায়ের নাম দয়াময়ী। দয়াময়ী বস্তুতই দয়ার আধার ছিলেন। আবার তাঁহার পুরুষোচিত সাহস ও শৌর্য্যবীর্য্যেরও অভাব ছিল না। শোনা যায়, একবার দয়াময়ী একদল ডাকাতের দলকে একাকী এক মাত্র তলোয়ার হাতে হঠাইয়া দিয়াছিলেন। ১৬৫৮ সালে সীতারামের জন্ম হয়। ছোট কালে তিনি মাতুলালয়ে

শিক্ষিত হন। সেকালের প্রথামত তিনি টোলে সংস্কৃত শিখিলেন এবং মৌলবীর নিকট আরবী শিখিলেন। ফরাসী ও উর্দ্দূ ভাষায় সীতারাম অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারিতেন। সেকালের বাঙ্লা সাহিত্যেও তাঁহার দখল ছিল। চণ্ডীদাসের কবিতা তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল।

দুর্ব্বল বাদ্‌শাহ, সীতারামের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। সেই সময়ে যশোহর বারটি চাকলায় বিভক্ত ছিল। বাদ্‌শাহ্ এই বারটি চাকলার ভূস্বামীদিগের অধিনেতা করিয়া সীতারামকে রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন।

কিন্তু ইহাতে গোল মিটিল না। আবু তোরাব সীতারামকে জব্দ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সীতারামও নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। তাঁহার হিন্দু রাজ্য স্থাপনের কথা শুনিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার আশ্রয়ে বাস করিতে লাগিল। দোকানদার, শিল্পী, আড়তদার, অন্যান্য ব্যবসায়ীরা আসিয়া সীতারামের নগর পরিপূর্ণ করিল। এইরূপে নূতন নগর—হাট, বাজার, গঞ্জ, গোলা বন্দরে ভরিয়া উঠিল। সীতারাম বহু অর্থ ব্যয় করিয়া রাস্তাঘাট তৈয়ার করাইলেন, বৃহৎ অট্টালিকা, দেবমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন, প্রকাণ্ড রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিলেন। এইরূপে সীতারাম প্রকাণ্ড নগর গড়িয়া তুলিলেন, নগরের নাম রাখিলেন মহম্মদপুর। ইহাতে মুসলমান প্রজাগণও সন্তুষ্ট রহিল।

মহম্মদপুরের চারিধারে প্রকাণ্ড দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর ঘিরিয়া

রাজধানী দুর্গম করিলেন। প্রাচীরের বাহিরে সুগভীর পরিখা খনন করাইলেন। প্রাচীরের স্থানে স্থানে কামান সংস্থাপন করিলেন। গোলা-গুলি কামান-বন্দুক নানা অস্ত্রে অস্ত্রাগার পূর্ণ হইতে লাগিল। গোপনে সুন্দরবন পথে অস্ত্র সংগৃহীত হইল। প্রজাদিগকে অস্ত্র-বিদ্যা ও যুদ্ধ-রীতি শিখাইতে লাগিলেন। কোন পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি অস্ত্রশিক্ষা হইতে অব্যাহতি পাইল না। দলে দলে সৈন্যদের কাওয়াজ দেখিতে দেখিতে নাগরিকগণও রণপ্রিয় ও সাহসী হইয়া উঠিল।

সীতারামের সু-শাসনে দেশে চুরি-ডাকাতি কমিয়া গেল, মগ-পাঠানদের দস্যুতা নিবারিত হইল, বড় বড় বনভূমি সমৃদ্ধ জনপদে পরিণত হইল, জলভূমি চাষের যোগ্য হইল, শান্তি ও ঋদ্ধির স্পর্শ পাইয়া দেশের চেহারা ফিরিয়া গেল। আর লোকের মুখে মুখে সীতারামের গুণগান আকাশ ছাপাইয়া উঠিল।

"ধন্য রাজা সীতারাম বাঙ্গালা বাহাদুর।
যার বলেতে চুরি ডাকাতি হয়ে গেল দূর॥
(এখন) বাঘে মানুষে একই ঘাটে সুখে জল খাবে॥
(এখন) রামীশ্যামী পোঁটলা বেধে গঙ্গাস্নানে যাবে॥

এদিকে ভূষণার ফৌজদার, নবাব মুর্শিদকুলিখাঁর নিকট সীতারামের বৃত্তান্ত জানাইয়া সৈন্য প্রার্থনা করিয়া পাঠাইল। নবাব, ফৌজদারের কথা কানে তুলিলেন না, সৈন্যও পাঠাইবার আবশ্যক বোধ করিলেন না। তখন বাধ্য হইয়া আবুতোরাব

নিজেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সীতারামের আস্পর্দ্ধা দমন করিবার জন্য যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

সীতারামও অবশ্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলেন এবং গুপ্তচরের মুখে আবুতোরাবের খোঁজ-খবর লইতেন। যে যুদ্ধ হইল উহাতে আবুতোরাবের সেনা-নায়ক দুইশত অশ্বারোহী সেনা সহ পরাজিত ও নিহত হইল, ফৌজদার সাহেব নিজেও নিহত হইলেন। সীতারামের সেনাদল ভূষণা দখল করিয়া জয়ধ্বনিতে আকাশ কাঁপাইয়া তুলিল। চারিদিকে সীতারামের জয়জয়কার পড়িয়া গেল।

আবুতোরাবের নিধন-সংবাদ মুর্শিদাবাদে পৌঁছিলে মুর্শিদকুলি খাঁ ভীত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। তিনি সীতারামকে দমন করিবার জন্য একদল সুবাদারী সেনা পাঠাইলেন এবং বাঙ্লার জমিদারদিগকে জানাইয়া দিলেন, যাহার রাজ্যের মধ্য দিয়া সীতারাম পলায়ন করিবে তাহাকে রাজচ্যুত হইয়া বিশেষ শাস্তি পাইতে হইবে। সুতরাং সীতারামের সাহায্যে কেহ আসিল না, বরং তাঁহার বিরুদ্ধে অনেকেই জুটিয়া গেল।

সীতারামও বুঝিলেন এবার তাঁহার জীবন-মরণ সমস্যা। তিনিও সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া সমরাঙ্গনে যাত্রা করিলেন। ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কামানের ধূমে রণাঙ্গন আঁধার হইল, শব্দে কর্ণ বধির হইল। সীতারামের সেনাদল মোরিয়া হইয়া লড়িতে লাগিল, কেননা তাহারা লড়িতেছিল তাহাদের স্বাধিকার ও স্বাধীনতার জন্য, নবাব সেনা আত্ম-মর্য্যাদা ও সম্মানের জন্য

লড়িতেছিল। কিন্তু সেই বিশাল নবাব-সেনার সঙ্গে মুষ্টিমেয় মজুর ও কৃষাণ সেনা কতক্ষণ লড়িতে পারে? "সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতি নিহত হইলে, বক্তার খাঁ, মুচরা সিংহ, গবর দালান প্রভৃতি বীরগণ সীতারামের রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সীতারাম বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদের রাজ-কারাগারে স্থান লাভ করিয়া যখন শুনিলেন, তাঁহার জন্য তীক্ষ্ণ শূল প্রস্তুত হইতেছে, তখন বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক সাহায্যে প্রাণত্যাগ করিলেন; বঙ্গের স্বাধীনতালিপ্সু ভূস্বামীদিগের কাহিনী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হইল।" মহম্মদপুর শ্মশানে পরিণত হইল।

মোহনলাল

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেশী-বিদেশী সংগ্রামে যাঁহারা স্বদেশ ও স্বশাসন রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন মোহনলাল তাঁহাদেরই একজন। মোহনলালের বীরত্ব-গাথা আজ বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত।

মোহনলাল একজন সামান্য লোক ছিলেন। তাঁহাকে কেহ জানিত না, রাজদরবারে তাঁহার সম্মান-প্রতিপত্তি কিছুই ছিল না। তখন নবাব সিরাজদ্দৌল্লা বাঙ্‌লার মসনদে বসেন নাই—সেই সময়ে মোহনলালের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। এই পরিচয়ই ক্রমশঃ ঘনিষ্ট হইয়া মোহনলালের উন্নতির পথ মুক্ত করিয়া দেয়।

মোহনলালের ভাগ্য সিরাজের সহিত গ্রথিত ছিল। যখন আলিবর্দ্দি খাঁর মৃত্যু হইল তখন সিরাজদ্দৌলা বাঙ্‌লা, বিহার ও উড়িষ্যার নবাব হইলেন। মোহনলাল এই সময়ের মধ্যে সাধারণ সৈনিক হইতে অন্যতম সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং মহারাজ উপাধিতে ভূষিত হইলেন। মোহনলাল বুদ্ধিবলে ও কর্ম্মনিষ্ঠায় বাঙ্‌লার দেওয়ান ও সিরাজের প্রধান মন্ত্রী হইলেন, বাহুবলে ও বিচক্ষণতায় পাঁচহাজার সৈন্যের সেনাপতি হইলেন। সিরাজদ্দৌল্লা সর্ব্বদাই মোহনলালের পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

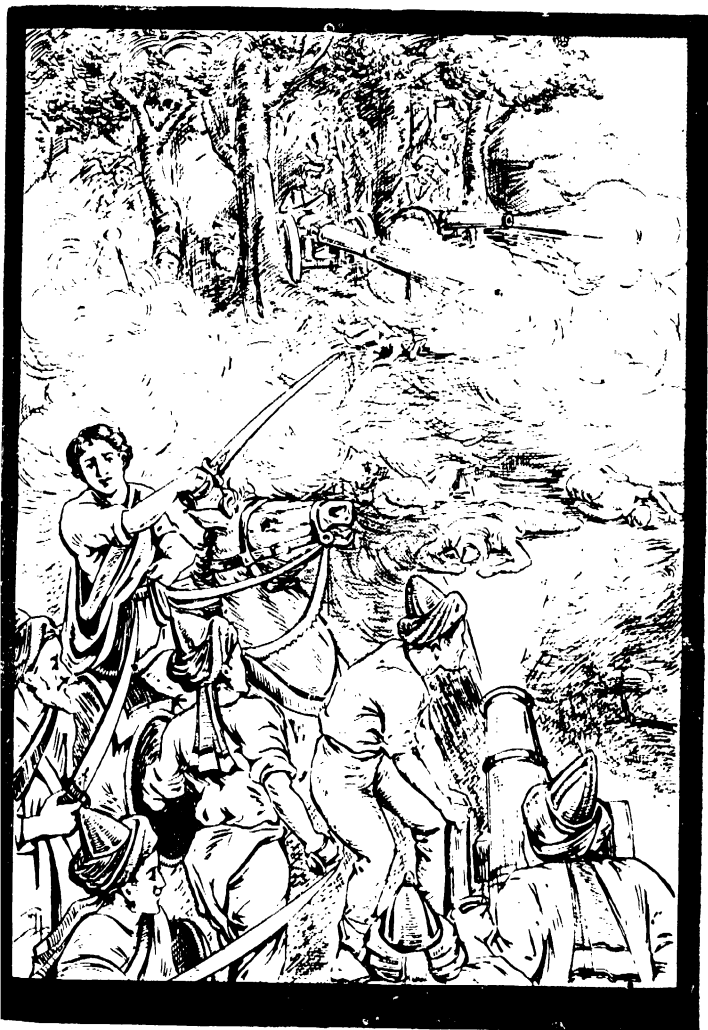
মোহনলালের মত কর্ম্মনিষ্ঠ, নির্ভীক ও বিচক্ষণ সেনাপতি তখনকার দিনে বাঙ্‌লায় আর ছিল না।

পূর্ণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গ যখন দিল্লীর বাদশাহের প্রতিপোষকতায় গর্ব্বিত হইয়া প্রকাশ্য ভাবে সিরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করিয়া বসিলেন, তখন বাধ্য হইয়া সিরাজকে তাঁহার বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইয়াছিল। সেই লড়াইয়ে মোহনলালের সেনাপতিত্বেই সিরাজের জয় হইল।

বিহারের নবাব রাজা রামনারায়ণ দিল্লীর বাদ্‌শাহকে রোধ করিবার পথ সসৈন্যে আগলাইয়া রাখিলেন। মুর্শিদাবাদ হইতে স্বয়ং সিরাজ একদল এবং মোহনলাল একদল, এই দুই দল সেনা পূর্ণিয়া অভিমুখে রওনা হইল। মহারাজ মোহনলালের সেনাদল জলঙ্গী বহিয়া, পদ্মা উত্তীর্ণ হইয়া, পূর্ণিয়া আক্রমণে অগ্রসর হইল।

শওকতজঙ্গ 'ইন্দ্রিয়াসক্ত, গর্ব্বোন্মত্ত, অকর্ম্মণ্য তরুণ যুবক।' তিনি কাহারো পরামর্শ শুনিতেন না, অথচ নিজেও কস্মিন্‌কালে রণভূমি চক্ষেও দেখেন নাই। কোন জ্ঞানবৃদ্ধ সেনানায়ক পরামর্শ দিতে আসিলে তিনি স্পষ্টই বলিয়া উঠিতেন, তিনি এই বয়সে এমন কত শত লড়াই করিয়াছেন।

যাহা হউক, শওকতজঙ্গের সেনাপতিগণ তাঁহার পক্ষে সুবিধাকর স্থানেই যুদ্ধভূমি নির্দ্দেশ করিয়া সেনাসংস্থাপন করিয়াছিলেন। "অল্প সেনা লইয়া সিরাজদ্দৌলার সেনাতরঙ্গের



পলাশী যুদ্ধে মোহনলাল

সম্মুখীন হইবার পক্ষে সেরূপ যুদ্ধভূমি সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। সম্মুখে বহুক্রোশবিস্তৃত জলাভূমি, তাহার উপর দিয়া শত্রুদলের গোলন্দাজ বা অশ্বারোহীদিগের অগ্রসর হইবার সম্ভাবনা নাই, সেই জলাভূমি উত্তীর্ণ হইয়া শওকতজঙ্গকে আক্রমণ করিবার উপযোগী একটী মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ; তাহার মুখে অল্প কয়েকশত সেনা সমাবেশ করিলেই, শত্রুসেনা ব্যূহভেদ করিতে পারিবে না।" কিন্তু শওকতের বুদ্ধির দোষে সেরূপ সেনা-সন্নিবেশ হইল না।

এদিকে মোহনলালের সেনাদলের সহিত মিরজাফরের সেনাদল মিলিত হইয়া মার মার শব্দ করিতে করিতে সাম্‌নের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু শওকতের সেনাদল কোন বাঁধা দিল না। দেখিতে দেখিতে মোহনলালের সেনা জলাভূমির পারে আসিয়া পড়িল। এখান হইতে মোহনলালের গোলন্দাজ সেনাদল কামান দাগিতে লাগিল। কিন্তু অধিকাংশ গোলা আধ-পথে যাইয়া জলাভূমির পাঁকে পড়িয়া ডুবিল। যাহা দুই একটা শওকতের সেনানিবাসে পড়িল, উহাতেই শওকত হতভম্ব হইয়া পড়িলেন। তিনি কি করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না, তাহার সেনাদল বিপন্ন হইয়া পড়িল। এদিকে মোহনলালও ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। এমন সময়ে এক আফগান সেনাপতি শওকতজঙ্গকে বলিলেন, আমি অনেক যুদ্ধ দেখিয়াছি, নিজামের অধীন অনেক লড়াই লড়িয়াছি, কিন্তু এমন যুদ্ধ কোন দিন দেখি নাই। যে যে-ভাবে পারে

লড়াই করে, যে যেমন পারে পলায়ন করে। সুশৃঙ্খল ভাবে লড়াই করিতে আজ্ঞা দিন। একথা বলিবামাত্র আগুনে ঘৃতাহুতি পড়িল, শওকত রাগে গর্জ্জিয়া উঠিলেন "যাও, যাও, আমাকে আর যুদ্ধ শিখাইতে আসিও না। নিজাম-উল্-মোল্‌ক গাধা! তাই সে তোমার কথা শুনিয়া সেনা চালনা করিত। আমি এমন তিনশত যুদ্ধ যুঝিলাম, আজ কিনা তুমি আমাকে যুদ্ধ কৌশল শিক্ষা দিতে আসিয়াছ?" বৃদ্ধ আফগান-সেনানী মানে মানে সরিয়া পড়িলেন।

শ্যামসুন্দর নামক একজন হিন্দু সেনাপতি নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আর শওকতের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই কামান লইয়া সেনাদলের সম্মুখভাগে যাইয়া ঘোর রবে গোলা ছাড়িতে লাগিলেন। শ্যামসুন্দর বাঙালী কায়স্থ। শওকতের পিতার আমল হইতে গোলন্দাজ সেনার বেতনাধ্যক্ষ ছিলেন। যুদ্ধ ব্যাপারে কোন দিন তেমন শিক্ষিত হন নাই। তবে সেকালে সকলেই কিছু-না-কিছু যুদ্ধবিদ্যা শিখিত, তিনিও সেইরূপ শিক্ষিত ছিলেন। যখন এই যুদ্ধ বাধিল, তখন শ্যামসুন্দর লেখনী ছাড়িয়া গোলন্দাজ সেনার সেনাপতি হইলেন। "অশিক্ষিত শ্যামসুন্দর এরূপ বীর প্রতাপে অনলবর্ষণ করিতে লাগিলেন যে, রণপণ্ডিত মোহনলাল স্তম্ভিত হইয়া অর্দ্ধ পথে অশ্বরশ্মি সংযত করিতে বাধ্য হইলেন। শ্যামসুন্দরের কামান ভীম কলরবে ঘন ঘন অনলবর্ষণ করিয়া মোহনলালের সেনাপ্রবাহ আলোড়িত করিয়া তুলিল।"

শ্যামসুন্দরের বীরত্বে শওকতজঙ্গ একেবারে উত্তেজিত হইয়া আদেশ করিয়া দিলেন, অশ্বারোহী সেনা সম্মুখে অগ্রসর হোক্। সেনাপতিগণ প্রতিবাদ করিলে কি হইবে? দলে দলে অশ্বারোহী কর্দ্দমময় জলাভূমিতে অচল হইয়া উভয় পক্ষের গোলাবর্ষণে প্রাণ হারাইল।

ইতোমধ্যে শওকতজঙ্গ শিবিরে যাইয়া সহচরীদিগের সঙ্গীত-মোহে এবং ভাঙ্গ ও সুরার প্রভাবে অচেতন হইয়া পড়িলেন। যুদ্ধের সঙ্কটময় সময়ে সেনাদলকে উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে সেনাপতিগণ অচেতন শওকতকে ধরাধরি করিয়া কোন রকমে হাতীর উপর বসাইয়া দিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া সেনাদল উৎসাহিত হইবে কি, আরো নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল। এমন সময়ে মোহনলালের সেনাদলের একটি গুলি আসিয়া তাঁহার কপালে বিদ্ধ হইল, সব শেষ হইল।

ইহার দুই দিন পরে মহারাজ মোহনলাল বিজয়ী বীরবেশে পূর্ণিয়া প্রবেশ করিয়া শান্তি সংস্থাপন করিলেন। দেশ শান্ত ভাব ধারণ করিলে মোহনলাল নিজ পুত্রকে পূর্ণিয়ার নবাব পদে অভিষিক্ত করিয়াই মুর্শিদাবাদের পথে রাজমহলে সিরাজের সহিত মিলিত হইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর মহারাজ মোহনলালকে আমরা পলাশীর রণাঙ্গনে দেখিতে পাই। পলাশীর ময়দানে বাঙালীর ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তিত হইল। এখানে ইংরাজ ও বাঙালীর বল পরীক্ষা হয় নাই। পলাশীর ময়দানে যাহা হইয়াছিল তাহা আর যাহাই হোক

ইংরাজের সহিত বাঙ্‌লার নবাবের যুদ্ধ হয় নাই, যাহা হইয়াছিল তাহা যুদ্ধের অভিনয় মাত্র। অভিনয় অংশে বিশ্বাস-ঘাতক মীরজাফর, ইয়ারলতিফ ও রায় দুর্লভ—এই তিনজনের অধিনেতৃত্বেই সিরাজের পঞ্চাশ হাজার সেনার মধ্যে পঁয়তাল্লিশ হাজার ছিল। মাত্র পাঁচ হাজার সেনা লইয়া মীরমদন ও মোহনলাল ইংরেজ সেনা আতঙ্কিত করিয়াছিলেন।

মীরজাফর, রায় দুর্লভ, ইয়ারলতিফ খাঁ, জগৎ শেঠ প্রমুখ সেকালের বাঙ্‌লার নেতৃবৃন্দ ইংরাজ নেতা ক্লাইবের সহায়তায় নবাব সিরাজদ্দৌলাকে বাঙ্‌লার সিংহাসন হইতে বিচ্যুত করিবার জন্য এক ভীষণ ষড়্‌যন্ত্র করেন। ক্লাইব মীরজাফরকে নবাবী পদ পাওয়ায় সাহায্য করিবেন বলিয়া স্বীকার করেন। এই আত্মবিধ্বংসী, স্বদেশদ্রোহী ষড়যন্ত্র পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে রূপ লইয়া ফুটিয়া উঠিল। যাহারা স্বদেশকে এমন হাল্‌কা জিনিষ ভাবিয়া এমন তুচ্ছভাবে হেলায়-হেলায় পরের হাতে তুলিয়া দিয়াছে, যাহারা নিজের হাতে স্বজাতির গলায় বিদেশীর শাসন-ডোর হাসিতে হাসিতে পরাইয়া দিয়াছে, তাহাদের নৈতিক অধঃপতন কত শোচনীয় হইয়াছিল, ভাবিলে লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়।

গঙ্গাতীরে পলাশীর ময়দানে উভয় পক্ষ সেনা সন্নিবেশ করিলেন। গঙ্গাতীরে "লাখবাগ" নামক আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ পরিপূর্ণ এক প্রকাণ্ড বন ছিল। ক্লাইব ইংরাজ সৈন্য উহার সম্মুখে সমাবেশ করিলেন।

সিরাজের পক্ষীয় সেনাপতিত্রয় মিরজাফর, ইয়ার লতিফ ও

রায় দুর্লভ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে তিন মাইল ব্যাপী দীর্ঘাকার সেনাদল সন্নিবিষ্ট করিলেন। এক পাশে সিরাজের শিবির স্থাপিত হইল। উহার সম্মুখ ভাগে দূরে অন্যতম সেনানায়ক মোহনলাল ও মীরমদন গোলন্দাজ ও অশ্বারোহী সেনাসহ ব্যূহ রচনা করিলেন।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে জুন স্মরণীয় দিন। সেদিন বাঙ্‌লার স্বাধীনতার স্বর্ণ-কিরীট ভূলুণ্ঠিত হইল, বিনিময়ে পরাধীনতার লৌহ-নিগড়ে বাঙ্‌লার বাঁধন দৃঢ় হইল। সেদিন ভোর আটটার সময় মীরমদনের গোলন্দাজ সেনাগণ প্রথম কামান দাগিলেন। ইংরেজ সেনাও প্রত্যুত্তর দিল। প্রতি মিনিটে একটি করিয়া ইংরাজ সেনা হত হইতে লাগিল। আধ ঘণ্টা এইরূপ চলিল, তৎপর ক্লাইব আত্মরক্ষার জন্য আম্রকুঞ্জে আশ্রয় লইলেন। ইংরাজকে আমের বনে ঢুকিতে দেখিয়া মীরমদন একদল অশ্বারোহী সেনা লইয়া তাহাদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। এই সময়ে হঠাৎ একটা গোলা আসিয়া মীরমদনের উরুদেশ ভেদ করাতে তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হন। মীরমদনকে আহত দেখিয়া সেনাপতি মোহনলাল অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তিনি সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া ভীষণভাবে ইংরেজসেনা আক্রমণ করিলেন।

ইহার মধ্যে এক ব্যাপার ঘটিয়া গেল। মীরমদনের পতনে সিরাজদ্দৌলা ব্যাকুল হইয়া মিরজাফরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং তাঁহার পায়ে নিজ উষ্ণীষ রাখিয়া বলিলেন—'এ বিপদে তুমি নিজের মান-ইজ্জৎ রক্ষা কর। তোমার উপর সব নির্ভর

করিতেছে।' বিশ্বাস-ঘাতক কুচক্রী মীরজাফর বলিলেন,—'নিশ্চয় শত্রু জয় করিব। তবে আজ সৈন্যগণ অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা শিবিরে ফিরিয়া আসুক, কাল প্রভাতে আবার লড়াই করা হইবে।' মীরজাফরের কথায় বিশ্বাস করিয়া সিরাজ সেনাদলকে শিবিরে ফিরিতে আদেশ করিলেন। মহারাজ মোহনলালের নিকট যখন এ সংবাদ পৌঁছিল তখন তিনি ভীম বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। তিনি বীরের মত সসম্ভ্রমে বলিয়া পাঠাইলেন—"আর দুই চারি দণ্ডের মধ্যেই যুদ্ধ শেষ হইবে, এখন কি শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার সময়? পদমাত্র পশ্চাৎ-গামী হইলে সিপাহীদল ছত্রভঙ্গ হইয়া সর্ব্বনাশ সংঘটিত করিবে। ফিরিব না, যুদ্ধ করিব।" মীরজাফর দেখিলেন, বড়ই মুস্কিল। তাঁহার ইচ্ছা না যে ক্লাইবকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার গুপ্ত সর্ত্ত ভঙ্গ করেন। তিনি আবার নানাপ্রকারে সিরাজের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়া মোহনলালকে শিবিরে ফিরিতে আদেশ করিলেন। আবার ফিরিবার সংবাদ পাইয়া ক্রোধে মোহনলালের চোখ হইতে আগুন ছুটিতে লাগিল। সামরিক রীতি অনুসারে তিনি সেনাপতির হুকুম না মানিয়া পারেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া সেনাদল লইয়া ধীরে ধীরে যথাসম্ভব শ্রেণীবদ্ধভাবে শিবিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

মোহনলালকে ফিরিতে দেখিয়া ক্লাইবের সেনা আমের বন হইতে বাহির হইয়া আসিল। ইংরাজ সেনাদল অগ্রসর হইয়া বাঙালী সেনাদলকে আক্রমণ করিল। ইহা দেখিয়া মোহনলাল

আবার ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। পশ্চাৎপদ সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া শেষ আহ্বান শুনাইলেন—

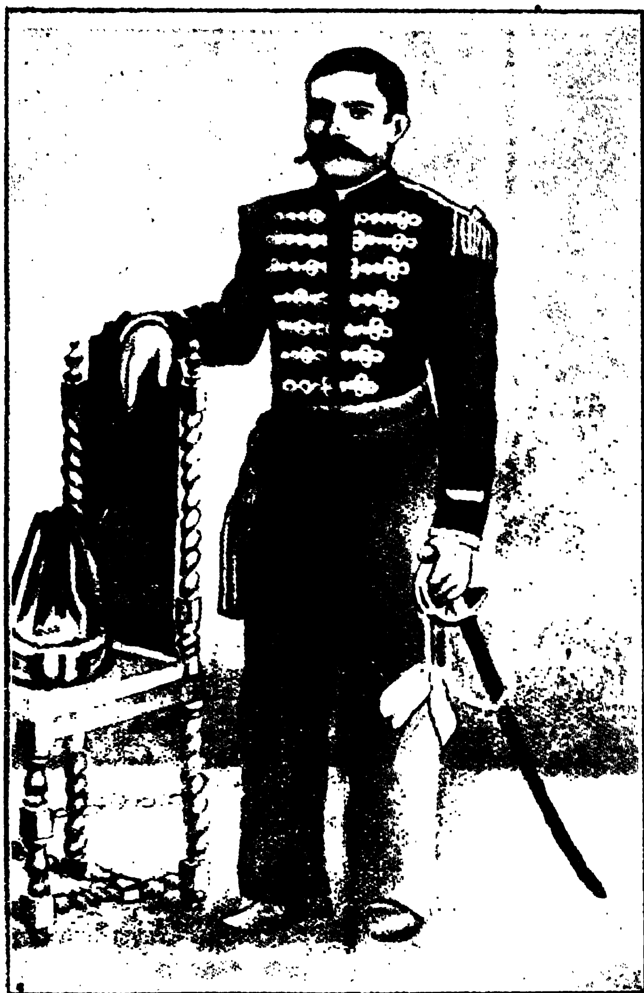
"দাঁড়ারে! দাঁড়ারে ফিরে! দাঁড়ারে যবন!
দাঁড়াও ক্ষত্রিয়গণ!
যদি ভঙ্গে দেও রণ,"—
গর্জ্জিলা মোহনলাল,—"নিকট শমন।
"আজি এই রণে যদি কর পলায়ন,
মনেতে জানিও স্থির,
কারো না থাকিবে শির,
সবান্ধবে যাবে সবে শমন ভবন।
"ভারতে পাবি না স্থান করিতে বিশ্রাম।
নবাবের মাথা খেয়ে,
কেমনে আসিলি ধেয়ে,
মরিবি মরিবি ওরে যবন সন্তান।"

হৃদয়ে হৃদয়ে বিদ্যুৎ ছুটিল। বাঙালী সেনা হঠিল না; আবার যুদ্ধ সুরু হইল।

এদিকে সিরাজ দেখিলেন, তাঁহার প্রধান সেনাপতি মীরজাফর, ইয়ার লতিফ ও রায় দুর্লভ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহাদের একটি সেনাও কোন প্রকারে যুদ্ধোদ্যম দেখাইল না। ইহাতে সিরাজ মর্ম্মাহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ রওনা হইলেন, ভাবিলেন যদি পরাজয়ই হয় তবে পলাশীতে থাকা অপেক্ষা মুর্শিদাবাদে

যাওয়াই ভাল। বীরবর মোহনলাল বৈকাল ৫টা পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়া যখন দেখিলেন, বিশ্বাসঘাতক ও চক্রান্তকারী সেনাপতিগণ কিছুই করিতেছে না, তখন তিনিও সিরাজের পার্শ্বরক্ষার্থ মুর্শিদাবাদে প্রস্থান করিলেন।

সিরাজদ্দৌলা যখন মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর ছিলেন, সেই সময়ে মহাবীর মোহনলাল মীরজাফরের অনুচরবর্গ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। মোহনলাল সমস্ত ধন-সম্পদ সহ শত্রু হস্তে বিনাশ পাইলেন। বাঙ্লার বীর গেল, বীরত্ব গেল, বীরত্বের সম্মান লোপ পাইল।



কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

কর্ণেল সুরেশ বিশ্বাস

অন্ধকার রাত্রি। সহরের রাস্তাঘাটে লোক মোটেই নাই। সারা সহরটা পোড়ো বাড়ীর মত শূন্যময়। মাঝে মাঝে দূর হইতে গোলা আসিয়া সশব্দে বড় বড় অট্টালিকার মাথায় পড়িয়া উহা বিধস্ত করিতেছে। গোলার আলোতে দেখা যায়, সহরের সমস্ত বড় বড় বাড়ী-ঘর ধ্বংসের স্তূপ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, রাস্তাঘাট আর চিনিবার জো নাই, থাকিয়া থাকিয়া আহতের আর্ত্তনাদ কাণে ভাসিয়া আইসে।

এই অবরুদ্ধ নগরের প্রধান সেনাপতি যখন দেখিলেন, রক্ষার আর কোন উপায় নাই, তখন নিতান্ত হতাশভাবে সমবেত সেনানীগণকে বলিলেন—"এখানে এমন সেনানী আছেন কি যিনি মাত্র পঞ্চাশটি সেনা লইয়া শত্রুদলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারেন?"

"একবার চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারি"—পৌরুষকণ্ঠে সর্ব্ব-প্রথম যিনি দাঁড়াইয়া এ কথাকয়টি বলিয়া উঠিলেন সকলে সবিস্ময়ে চাহিয়া দেখিলেন, তিনি নবাগত বিদেশী সেনানী লেফ্‌টেনাণ্ট সুরেশ বিশ্বাস।

লেফ্‌টেনাণ্ট সুরেশ পঞ্চাশটি সেনা লইয়া সেই রাত্রিতে শত্রু-শিবিরের দিকে ছুটিলেন। কিন্তু বেশীদূর যাইতে না যাইতেই অনবরত গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। সুরেশের সেনাগণ আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। অবশেষে সুরেশ অগ্রগামী হইয়া চীৎকার করিয়া বলিল—আমায় অনুসরণ কর, এবং সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুসেনার উপর দৌড়াইয়া গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শত্রুসেনা এরূপ অমানুষিক বীরবিক্রমে স্তম্ভিত হইয়া গেল, মুহূর্ত্তের জন্য গোলাবর্ষণ স্থগিত হইল। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সুরেশের ভীষণ আক্রমণ শত্রুদল কিছুতেই সহিতে পারিল না, ধীরে ধীরে পিছু হঠিল। লেফ্‌টেনাণ্ট সুরেশের জয় হইল।

ইহাই সুপ্রসিদ্ধ নাথরয়ের লড়াই। যিনি এই যুদ্ধে অসম সাহসিক বীরত্ব দেখাইয়া বিজয়ী হইয়া আসিয়াছিলেন, সেই সুরেশ বিশ্বাস আমাদের বাঙ্‌লা দেশেরই কীর্ত্তিমান্ পুরুষ।

সুরেশচন্দ্র ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে নদীয়ার নিকটবর্ত্তী নাথপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার বাবার নাম ৺গিরিশচন্দ্র বিশ্বাস। ইনি কলিকাতায় কোন আফিসে চাকুরী করিতেন।

ছোটকাল হইতেই সুরেশ দুরন্ত ছিলেন। লেখাপড়ার চেয়ে খেলাধূলায়ই তাঁহার উৎসাহ বেশী ছিল। তাঁহার বাবা তাঁহাকে কলিকাতার লণ্ডন মিশন স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন। পৃথিবীতে কতকগুলি লোক দেখা যায় যাহারা ছোটকাল হইতেই দশের উপর আধিপত্য করিয়া বেড়ায়, তাহাদের জন্মই যেন নেতৃত্ব করিবার জন্য। সুরেশও এই ধাতের লোক ছিলেন।

তাঁহারও একটি দল ছিল এবং তিনি এই দলের সর্দ্দার ছিলেন। স্কুলের যত সব ডানপিটে ছেলে আসিয়া জুটিত এই দলে।

সুরেশ ছোট কাল হইতেই নির্ভীক ছিলেন। ডর-ভয় বলিয়া তাঁহার জীবনে কিছু ছিল না। এক দিন এই বে-পরোয়া ছেলেটি মাছ ধরিবার ছিপ লইয়া বাড়ী ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে ঠিক তাঁহারই সম্মুখে এক ভয়ঙ্কর বুনো শূয়র ভীষণ বেগে আসিয়া পড়িল। সুরেশ নিজের সঙ্গী ছেলে দুইটিকে পালাইতে বলিয়া নিজে ছিপ লইয়াই শূয়রটার মাথায় এমন আঘাত মারিলেন যে সেই প্রকাণ্ড জানোয়ারটা গোঁ গোঁ করিতে লাগিল। ইতোমধ্যে কয়েকটি কুকুর ও একদল সাহেব-শিকারী আসিয়া হাজির হইল। সুরেশ নিরাপদ হইলেন। এই শিকারীগণ শূয়রটার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছিলেন, বালক সুরেশের এই অসম সাহসিক কার্য্য দেখিয়া তাহারা বিস্মিত হইলেন।

ইহারা নীলকর সাহেব। এই শূয়র-মারা উপলক্ষে ইহাদের সহিত সুরেশের খাতির-পরিচয় হয়। ইহাদের সংস্পর্শে আসিয়া সুরেশ বেশ ইংরাজী শিখেন।

লণ্ডন মিশন স্কুলের হেড্‌মাষ্টার সাহেব সুরেশকে খুব ভালবাসিতেন এবং তাঁহাকে ভাল করিতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। কিন্তু দুরন্ত সুরেশ আর শিষ্ট-শান্ত হইলেন না। অবশেষে একদিন সুরেশ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া বসিলেন।

ইহার পর সুরেশের বড় দুঃখের জীবন আরম্ভ হয়। বাবা তাঁহাকে ত্যাগ করিলেন, বাড়ীতে তাঁহার ঠাঁই রহিল না। সুরেশ

৭—

রাজপথের ভিখারী হইলেন। এই সময়ে তাঁহার বিলাত যাইবার প্রবল ইচ্ছা হয়। চাকুরী করিয়া টাকা সংগ্রহের জন্য কত জনের নিকট ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইলেন। কলিকাতা, রেঙ্গুন, মাদ্রাজ— কোথাও কোন সুবিধা হইল না।

অবশেষে কলিকাতার এক জাহাজের কাপ্তানের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং এই কাপ্তানটি তাঁহাকে তাহার জাহাজের ষ্টুয়ার্ডের কাজে ভর্ত্তি করিয়া লইলেন।

সুরেশ বিলাত গেলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহার পরিচিত বড়-কেহ ছিল না। লণ্ডনের রাস্তায় রাস্তায় সুরেশ পত্রিকা বেচিতে সুরু করিলেন, তারপর কিছুদিন ফেরিওয়ালা সাজিলেন। কিন্তু কোন কাজেই তেমন সুবিধা হইল না।

অবশেষে সুরেশ এক সার্কাসের দলে ঢুকিলেন। ছোট কাল হইতেই সুরেশ বলিষ্ঠ, সাহসী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। শীঘ্রই তিনি বন্যপশু-বশকারী বলিয়া সমস্ত য়ুরোপে খ্যাতি লাভ করেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে সুরেশ সার্কাস পার্টির সহিত আমেরিকার যুক্তরাজ্যে যান। সেখান হইতে কিছুদিন পর দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিল দেশে গেলেন এবং উহার রাজধানী রায়ও-ডি-জেনেরোর রাজকীয় পশুশালার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন।

ইহার কিছুকাল পরে ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সুরেশ সেনাবিভাগে প্রবেশলাভ করেন। বিদেশী বলিয়া তাঁহার পদোন্নতি খুব ধীরে হইয়াছিল। প্রথম তিনি স্যাণ্টাক্রুজে কর্পোরাল হন। ইহার পর তিনি প্রথম লেফ্‌টেনাণ্ট পদ লাভ করেন। এই পদে

থাকিয়াই নাথেরয়ের যুদ্ধে অসম সাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া অবরুদ্ধ নগরীর উদ্ধার করেন। পরিশেষে সুরেশচন্দ্র কর্ণেল উপাধিতে ভূষিত হইলেন। যিনি একদিন পথের ভিখারী হইয়া-ছিলেন, আপন সাহসিকতা ও কর্ম্মনিষ্ঠায় তিনিই এখন সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভে সমর্থ হইলেন। সুরেশ ব্রেজিলের এক রমণীকে বিবাহ করেন এবং জীবনের শেষ ভাগটা সুখে স্বাচ্ছন্দ্যেই কাটাইয়া যান। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

কর্ণেল সুরেশচন্দ্র এ যুগের প্রথম বাঙালী বীর যোদ্ধা। দেশের দুর্ভাগ্য, তাঁহার দুর্দ্দম সামরিক প্রতিভা অবস্থার বিপর্য্যয়ে বাঙ্‌লার মাটিতে ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইল না। দেশের দুর্দ্দান্ত তরুণের দলকে আজ সুরেশের আদর্শই মাথায় লইয়া বাহির হইতে হইবে। ভবঘুরের দল দেশে যাহারা আছে, তাহাদিগকে সুরেশের মতই দুনিয়ার বুকে ছড়াইয়া পড়িয়া একটা দাগ রাখিতে হইবে।

য়ুরোপীয় মহাসমরে বাঙালী

পলাশীর প্রাঙ্গণে যে রণধ্বনি মিলাইয়া গেল তাহার পর সুদীর্ঘ দেড়শত বৎসরের মধ্যে বাঙালীর কাণে তেমনতর রণ-দুন্দুভি পশে নাই। বাঙালীর কোষের অসি আর ঝণৎকার করে নাই, তাহার হাতের বন্দুক আগুন ছড়ায় নাই।

তারপর হঠাৎ যখন ১৯১৪ সালে য়ুরোপে মহাসমর বাধিয়া গেল, তখন ভাগ্যক্রমে ডাক পড়িল বাঙালীকে। দীর্ঘদিনের অনভ্যাসে বাঙালী তাহার যুদ্ধ-কৌশল ভুলিয়াছিল। কিন্তু যুগ-যুগান্তের পিতৃ-পিতামহের অবদান একেবারে লুপ্ত হইতে পারে না। য়ুরোপের রণভেরী বাঙ্‌লার সুপ্ত চেতনাকে পরশ দানে বাঁচাইয়া তুলিল।

সেদিন বাঙালীর ইতিহাসের এক শুভদিন বলিতে হইবে। সে ১৩২২ সনের ২১শে ভাদ্র। বাঙালী সেদিন সৈনিক সাজিল, কাওয়াজ করিল, ঘাড়ে বন্দুক কাঁধে করিয়া কোন্ সুদূরের লড়াইয়ের ময়দানে ছুটিয়া চলিল।

বাঙ্‌লা জুড়িয়া রণযাত্রার এক সাড়া পড়িয়া গেল। দলে দলে বাঙালী যুবক বঙ্গ-বাহিনীর পতাকাতলে মিলিত হইল। সে কী উৎসাহ, কী উদ্দীপনা! বাঙ্‌লার তরুণ দল জাতির

ভ্রমমূলক কলঙ্কের কালো রেখাটি হৃদয়ের শোণিতে শোধন করিবার আকাঙ্ক্ষা বুকে চাপিয়া রণাঙ্গণে ঝাঁপাইয়া পড়িল! দেখিতে দেখিতে ৪৮ দিনের মধ্যে দুইটি সেনাদল (কোম্পানী, ২২৮ জন লইয়া) গঠিত হইয়া গেল। ইহার নাম হইল বাঙালী ডবল কোম্পানী। ১৯১৬ সালে ২৮ নবেম্বর ডবল কোম্পানীর তেরটি দল পূর্ণ হইল।

ইহার পর ডবল কোম্পানী বঙ্গবাহিনীতে (Regiment) পরিণত হইল। আবার দলে দলে যুবকগণ সেনাদলে যোগদান করিলেন।

বাঙালী সেনাদের সম্বন্ধে লেফ্‌টেনাণ্ট মিল লিখিয়াছিলেন—ইঁহারাই আমার সেনাদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল।

মেসোপটেমিয়ায় এবং ফ্রান্সের সীমান্তে বাঙালী সেনা সুখ্যাতির সহিত কাজ করিয়াছেন। কার্য্য-দক্ষতা গুণে ইঁহারা ফরাসীদেশে সাধারণ পদাতিক হইতে গোলন্দাজ সেনাদলে প্রবেশ লাভ করিয়া চমৎকার কাজ করিয়াছেন। ফরাসী সেনাবিভাগে বাঙালী সেনা ব্রিগেডিয়ার পদ লাভ করিয়াছিলেন। বাঙালী সেনার কার্য্যদক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধি দেখিয়া একজন উচ্চ পদস্থ ফরাসী বলিয়াছিলেন—"বাঙালীদের মত আমাদের সকল রেজিমেণ্ট (regiment) গুলি হইলে অনেক সুবিধা হইত।"

এই যুদ্ধে আমরা দেখিতে পাই, সুযোগ ও সুবিধা পাইলে বাঙালী জগতের অন্যান্য সামরিক জাতির সঙ্গে কেমন পাল্লা লড়িয়া চলিতে পারে। বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালের যুদ্ধে যখন

কৌশল ও বুদ্ধিমত্তার উপরই সমস্ত নির্ভর করে তখন বাঙালীর মত স্বভাবতঃ তীক্ষ্ণবুদ্ধি জাতির পক্ষে জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৈনিক হওয়া মোটেই বিচিত্র নয়।

সৈনিক

লেফ্‌টেনাণ্ট ইন্দ্রলাল রায়

ইন্দ্রলাল রায় বরিশাল লাখুটিয়া-নিবাসী ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত পি এল রায়ের পুত্র। যখন য়ুরোপে মহাসমর বাধিল, সেই সময়ে তিনি ইংলণ্ডে মাতার সহিত বাস করিতেছিলেন। এই যুদ্ধে সামরিক বিভাগে ইন্দ্রলাল যোগদান করেন। সামরিক আকাশ-যান বিভাগে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন এবং আকাশ-যানের চালক-পদে (Pilot) বৃত হন।

এই সময়ে জর্ম্মন এরোপ্লেন হইতে যখন তখন গোলা বর্ষণে ইংলণ্ডবাসী আতঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইন্দ্রলালকে বিমান পোত লইয়া আকাশে আকাশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া শত্রু-পক্ষের বিমানপোত ধ্বংস করিতে হইত। এই কার্য্যে অসম সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়া ইন্দ্রলাল কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।

তাঁহার মৃত্যু বড়ই শোচনীয় ও করুণ, তবু উহা বীরোচিত এবং গৌরবের। একদিন ইন্দ্রলাল তিনজন সহকর্ম্মীর সহিত শত্রু পক্ষীয় উড়ো জাহাজের অনুসন্ধানে আকাশে উঠিয়াছেন। শত্রু



ইন্দ্রলাল রায়

পক্ষের চারিখানি উড়ো জাহাজের সঙ্গে তাঁহাদের দেখা হয়। এই সংঘর্ষে তিনখানি উড়ো জাহাজ ধ্বংস হইয়া পতিত হয়। উহার মধ্যে একখানি ইংরেজ পক্ষীয় এবং দুইখানি জর্ম্মনদের। এই সঙ্গে ইন্দ্রলালেরও মৃত্যু ঘটে। তিনিই ঐ উড়ো জাহাজখানি চালনা করিতেছিলেন।

ইন্দ্রলালের বীরত্ব ও কার্য্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রধান কর্ম্মচারী সেই সময়ে তাঁহার পিতার নিকট লিখিয়াছিলেন—"আকাশযান-বিভাগে যোগদানের সময় হইতেই আপনার পুত্রের দৃঢ় সঙ্কল্প ছিল যে, তিনি শত্রুর উড়ো জাহাজ ভূপাতিত করিবেন। অসাধারণ পরিচালন-দক্ষতায় এবং অদ্ভুত সাহসিক আক্রমণে তিনি তের দিনে বিপক্ষের নয়খানি উড়ো জাহাজ ধ্বংস করিয়াছিলেন। এরূপ কার্য্যকুশলতা বাস্তবিকই লিপিবদ্ধ করিবার যোগ্য।" তিনি অনেকবার একই অভিযানে একযোগে দুইখানি বিপক্ষের উড়ো জাহাজ ধ্বংস করিয়াছেন।

পরেশলাল রায়

পরেশলাল ইন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। ইনি যুদ্ধের সময় ইংলণ্ডে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এ পড়িতেছিলেন। ইনিও সমর বিভাগে একটি গোলন্দাজ সৈন্য দলে যোগদান করেন। ইনি তিনবৎসর ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে পরিখায় জীবন কাটান। সেই সময়ে কামান দাগিয়া বিপক্ষের বিরুদ্ধে অনলবর্ষণের সময় হঠাৎ

তিনি আহত হন। ইহার পর আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি সেনাবিভাগে সৈন্যদলের আবশ্যক জিনিষপত্র ও রশদ সরবরাহ কার্য্যে রক্ষীসেনার কার্য্য করিতেন। এই কার্য্য অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ ছিল এবং ইহাতে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষভাগে তিনি কমিশন-পদে উন্নীত হইবার জন্য মনোনীত হইয়াছিলেন।

যোগেন্দ্রনাথ সেন

যোগেন্দ্রনাথ শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পড়িয়া ইংলণ্ডে লিড্‌স্ বিশ্ববিদ্যালয়ে বি-এস্‌সি পড়েন। ইহার পর যুদ্ধের সময় তিনি সৈন্যদলে যোগদান করেন। তিনি প্রথমে অফিসার হইবার জন্য আবেদন করেন। কিন্তু ভারতবাসী বলিয়া উহা অগ্রাহ্য হয়। অবশেষে তিনি সাধারণ সৈন্যরূপেই যোগদান করিলেন। শিক্ষা লাভের পর তিনি প্রথমে মিশরে প্রেরিত হন এবং পরে ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে গমন করেন। তিনি অত্যন্ত কৃতিত্ব ও যোগ্যতার সহিত কাজ করেন। ১৯১৬ সালের ২২শে মে রাত্রিকালে ফ্রান্সের রণাঙ্গনে এই বীরযুবক প্রাণবিসর্জ্জন দেন। তাঁহার মৃতদেহ সামরিক রীতি অনুসারে সমাহিত হয়। তাঁহার সেনাদলের ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী লিখিয়াছিলেন—He died like a soldier doing his duty and doing it well. তিনি প্রকৃত যোদ্ধার মত সুচারুরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া মৃত্যুকে বরণ করিয়াছেন।

ক্যাপ্টেন কে বানার্জি

ইনি ভারতীয় জাতীয় মহাসভার সর্ব্বপ্রথম সভাপতি ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পৌত্র। যুদ্ধের সময় ইনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সেই সময়ে পড়া ছাড়িয়া ইনি অনেক চেষ্টা করিয়া অফিসার্স ট্রেনিং কোর নামক নবগঠিত সেনাদলে প্রবেশ লাভ করেন। ইনি সাহস ও কর্ম্মদক্ষতার পরিচয় দিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত ইনি মিশরে ছিলেন।

অজিতকুমার রুদ্র

অজিতকুমার দিল্লী সেণ্ট ষ্টিফেন্স কলেজের অধ্যক্ষের পুত্র। ইনি সিংহলের কান্দির ট্রিনিটি কলেজে পড়িতেন। যুদ্ধে যোগদান করিবার জন্য ইঁহার অত্যন্ত আগ্রহ হইয়াছিল। তিনি কোন রকমে পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৯১৬ সালে রয়াল ফুসিলিয়ার্স (Royal Fusiliers) নামক ইংলণ্ডের প্রাচীনতম সেনাদলে যোগদান করেন। ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে যাইয়া একবার তিনি গুরুতররূপে আহত হন। অতঃপর আরোগ্য লাভ করিয়া তিনি পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করেন। যুদ্ধ শেষ হইবার কয়েকমাস পূর্ব্বে তিনি কমিশন পদে মনোনীত হন।

এ কে দাশ-গুপ্ত

যখন যুদ্ধের আগুন য়ুরোপে ছড়াইয়া পড়ে সেই সময়ে ইনি ইংলণ্ডে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়িতেছিলেন। তিনি পড়া ছাড়িয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তি হইলেন। কিছুদিন সামরিক শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি ফ্রান্সের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত হন। যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সৈন্যদলের জিনিষপত্রাদি স্থানান্তরে প্রেরণের রক্ষী সেনারূপে কাজ করেন। ইহার পর তিনি সৈনিকরূপেও যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করেন।

হারাধন বক্সী

চন্দননগর হইতে যে কুড়িজন বাঙালী সর্ব্বপ্রথম ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে গমন করেন, তাঁহাদের অন্যতম শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সী। তিনি একজন ভাল গোলন্দাজ সেনা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সামরিক বিদ্যালয়ের নিম্ন ও উচ্চ পরীক্ষায় এবং অফিসার্‌স্ প্লেটুন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন এবং ব্রিগেডিয়ার পদ লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত হারাধন বক্সী প্রমুখ সেনাগণই বাঙালীদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধকার্য্যে যোগদান করেন। ইনিই একমাত্র বাঙালী সেনা যিনি বাংলা ভাষায় যুদ্ধ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার রচিত 'লড়াইয়ের নতুন কায়দা' বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট দান বলিতে হইবে।

স্বেচ্ছাসেবক

রণদাপ্রসাদ সাহা

রণদাপ্রসাদ বেঙ্গল এম্বুলান্স কোরের একজন স্বেচ্ছাসেবক ছিলেন। ১৯১৫ সালের অক্টোবর মাসে তিনি মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন। তাঁহার সাহস ও সেবাব্রত বাঙালীর নাম গৌরবিত ও যশস্বী করিয়া তুলিয়াছে।

অতিরিক্ত আমিষ আহারের জন্য ইংরেজ সেনাগণ এই সময়ে স্কার্ভি পীড়ায় আক্রান্ত হইতেছিল। উহার একমাত্র ঔষধ তাজা শাক-সব্জী ভক্ষণ। রণদাপ্রসাদ শাকসব্জী সংগ্রহের জন্য প্রত্যহ শিবির ছাড়িয়া বহুদূরে গমন করিতেন। সে সময়ে বিপক্ষের গোলা যেখানে সেখানে অতর্কিত ভাবে পড়িত। তাহাতে তিনি ভ্রুক্ষেপ করিতেন না। নিজের প্রাণের জন্য তিনি কোন দিন কর্ত্তব্য হইতে বিরত বা বিচলিত হন নাই।

বাগদাদে যখন ছিলেন, সেই সময়ে একদিন এক ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হয়। আর্ত্তনিবাসে আগুন ধরিয়া যায়। তখন রণদা-প্রসাদ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া আগুনের মধ্যে যাইয়া পীড়িত ও আহত সেনাদের উদ্ধার করিবার অনুমতি চাহেন। তাঁহাদের দলপতি কাপ্তেন কিং বলিলেন—অত উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই। সেনাগণ নিরাপদে আর্ত্তনিবাস হইতে বাহির হইয়াছে। রণদা বলিলেন—না সাহেব, তুমি জাননা। ত্রিশজন সেনা এরূপভাবে আহত যে তাহারা অন্যের সাহায্য ছাড়া কিছুতেই বাহির হইতে

পারবে না। এখন তাহাদিগকে উদ্ধার করা অসম্ভব নয়। তুমি অনুমতি দাও। রণদাপ্রসাদের ঐকান্তিক আগ্রহে সাহেব তাঁহাকে অনুমতি না দিয়া পারিলেন না। ইহার মধ্যে বঙ্গীয় অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবকগণও আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলের সমবেত চেষ্টায় আহত সেনারা রক্ষা পাইল।

১৯১৬ সালে যখন বাঙালীরা সেনাদলে ভর্ত্তি হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল, সেই সময়ে রণদা সেনাবিভাগে প্রবেশ করিলেন। তিনি সাধারণ সেনা হইতে জমাদার পদে উন্নীত হইয়াছিলেন। যুদ্ধের শেষে যুদ্ধশান্তি উৎসবে তিনি ৪৯ সংখ্যক বঙ্গবাহিনীর প্রতিনিধি রূপে ইংলণ্ডে নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন।

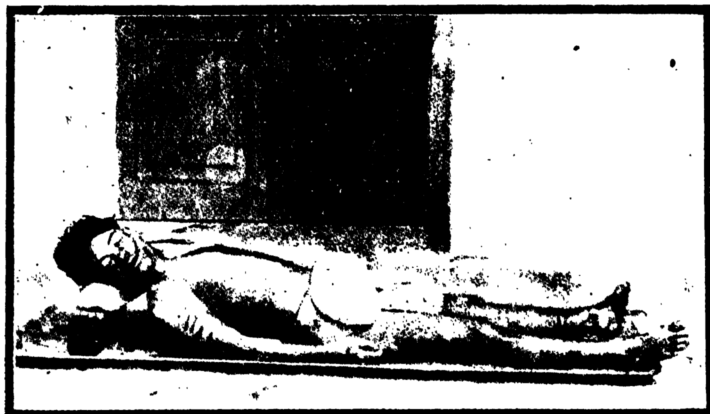
অমরেন্দ্রনাথ চম্পটী

হাবিলদার অমরেন্দ্রনাথ চম্পটী বেঙ্গল এম্বুলান্স কোরের একজন খ্যাতনামা স্বেচ্ছাসেবক। তিনি কলিকাতা পুলিশ কোর্টের একজন উদীয়মান উকীল ছিলেন। যুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক দলে ভর্ত্তি হইয়া মেসোপটেমিয়া গমন করেন। দলে ঢুকিয়া প্রথম হইতেই তিনি সকলের শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

মেসোপটেমিয়ায় যুদ্ধক্ষেত্রে অমরেন্দ্রনাথ যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও কর্ম্মতৎপরতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই যে-কোন জাতির পক্ষে পরম গৌরবের। তিনি অবশেষে কূট্-অল্-আমারায় সেনাপতি টাউনসেণ্ডের সহিত শত্রুহস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। সেই অবস্থায়ই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।



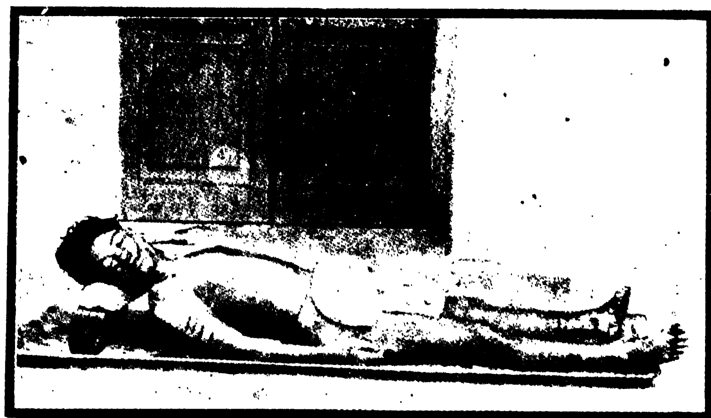
সতীন্দ্রনাথ সুর



চন্দ্রকান্ত দেব



যতীন্দ্রনাথ সুর



চন্দ্রকান্ত দেব

ক্যাপ্টেন কল্যাণকুমার মুখার্জি

কল্যাণকুমার সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্ স্বর্গীয় ক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। ইনি এদেশে এবং বিলাত হইতে ডাক্তারি পাশ করিয়া উত্তর ভারতে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। 'কাপ্টেন' তাঁহার ডাক্তারি উপাধি। যুদ্ধের সময় তিনি সরকারের আদেশে মেসোপটেমিয়ায় গমন করেন। সেখানে তিনি দুইবার আহত হইয়াও আর্ত্তসেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনিও কূট-অল্-আমারার অবরোধ কালে তুর্কী হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। তৎপর বন্দী বিনিময়ে মুক্ত হইয়া পুনরায় বন্দী হন এবং সেই অবস্থায় কোন তুর্কীনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বীরযুবক নির্ভীকতা ও কার্য্য-কুশলতার জন্য মিলিটারী ক্রস পাইয়াছিলেন।

ক্যাপ্টেন জ্যোতিলাল সেন

জ্যোতিলাল নববিধান ব্রাহ্মসমাজের বিহারীলাল সেন মহাশয়ের পুত্র। যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তিনি সেনাবিভাগে ডাক্তার হইয়া প্রবেশ করেন। মেসোপটেমিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে তিনি সাহসিকতা ও কর্ম্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়া মিলিটারী ক্রস লাভ করিয়াছিলেন।

চন্দ্রকান্ত-যতীন্দ্রনাথ

১৩৩৩ সনের ১৪ই বৈশাখ মঙ্গলবার যখন কলিকাতায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অরাজকতা চরম সীমায় উপনীত, সেই সময় মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটের হিন্দুপল্লী, সহস্রাধিক মুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হইল। সেই আক্রমণে বাঁধা দিবার জন্য চল্লিশ পঞ্চাশ জন বাঙালী হিন্দু ভদ্র যুবক লাঠি হস্তে অগ্রসর হইলেন। এই যুবক-দলে ত্রিপুরা জিলার ইব্রাহিমপুর গ্রাম-নিবাসী বাবু চন্দ্রকান্ত দেব ও বর্দ্ধমান জেলার কুলসী গ্রাম-নিবাসী বাবু যতীন্দ্রনাথ সুর নামক দুই যুবক ছিলেন। চন্দ্রকান্ত দেবের বয়স চব্বিশ বৎসর, তাঁহার পিতার নাম ৺নবীনচন্দ্র দেব। সংসায়ে তাঁহার জননী ও একটি দশ বৎসর বয়স্ক সহোদর ব্যতীত আর কেহই নাই। চন্দ্রকান্ত কলিকাতার মেসার্স আর সি সোম এণ্ড কোম্পানীর কারখানাতে কার্য্য করিয়া জননী ও ভ্রাতার ভরণপোষণ করিতেন। আর যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় থাকিয়া আইন অধ্যয়ন করিতেন এবং জেমস্ ফিণ্ডলে এণ্ড কোম্পানীর আফিসে কাজ করিতেন। গত ফাল্গুন মাসে যতীন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়াছিল। সংসারে তাঁহার বালিকা পত্নী, একটি বিধবা জননী ও দুইজন কনিষ্ঠ সহোদর ব্যতীত আর কেহই নাই।

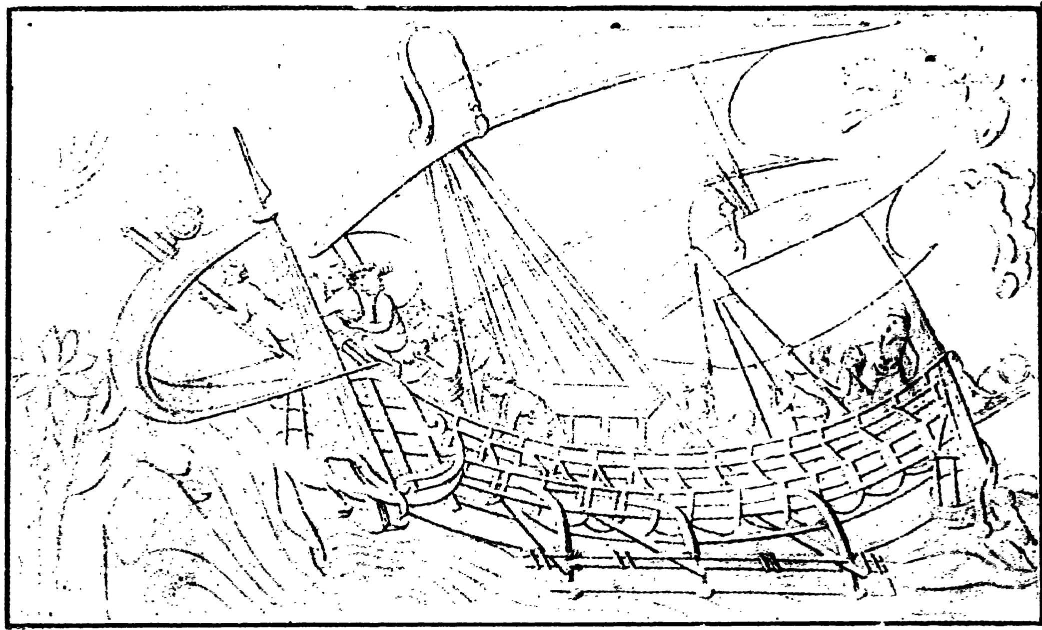
যখন মুসলমানগণ হিন্দুপল্লী আক্রমণ করিল, তখন যুবক চন্দ্রকান্ত লাঠি লইয়া সর্ব্বাগ্রে গিয়া মুসলমানদের গতি রোধ করিলেন। তাঁহার সাহস, বাহুবল ও লাঠিচালনা-কৌশল দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইল। যুবক যতীন্দ্রনাথও অমিত সাহসে আক্রমণকারীদিগকে বাঁধা দিতে লাগিলেন। সেদিন ঐ সকল হিন্দু ভদ্র যুবক অগ্রসর না হইলে মেছুয়াবাজারের হিন্দুমহল্লার যে কী ভীষণ দুরবস্থা হইত তাহা ভাবিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সশস্ত্র পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত না হইয়াছিল ততক্ষণ বাঙালী যুবকগণ প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করিয়া গুণ্ডাদের সহিত লড়াই করিতে লাগিলেন।

পুলিশ দাঙ্গার সংবাদ পাইবামাত্র ঘটনা স্থলে উপস্থিত হইল, এবং দাঙ্গাকারী গুণ্ডাগণকে ভয় দেখাইবার জন্য প্রথমে ফাঁকা আওয়াজ করিল। কিন্তু যখন কিছুতেই উহারা নিরস্ত হইল না, তখন পুলিশ গুলি চালাইতে স্থুরু করিল। গুলির ভয়ে দাঙ্গাবাজের দল যে যেদিকে পারিল পলাইল, যাহারা না পারিল, গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল। এই সময়ে হঠাৎ পুলিশের গুলির আঘাতে চন্দ্রকান্ত ও যতীন্দ্রনাথ নিহত হইলেন।

এই দুই বীর-যুবকের বীরত্বে ও সাহসেই মেছুয়াবাজার রক্ষা পাইয়াছিল, দুর্ব্বৃত্তগণের অত্যাচারের পথ রুদ্ধ হইয়াছিল। কলিকাতাবাসী, এই বীর যুবকদ্বয়ের সম্মানার্থে বিরাট শোভাযাত্রা বাহির করিলেন। পুষ্পশয্যায় শায়িত করিয়া মহাসমারোহে সমস্ত বড় বড় রাস্তাদিয়া শোভাযাত্রা চলিল। রাস্তায় লোকে

লোকারণ্য। সকলেই বীরযুবকদ্বয়কে শেষ দেখা দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব। ছাদের উপর হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। তারপর ধীরে ধীরে শোভাযাত্রা নিমতলা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। ধূপচন্দন ও ঘৃতদ্বারা বীরযুবকদ্বয়ের দেহের শেষ কার্য্য সমাধা হইল। পবিত্র অগ্নিশিখা সহস্র শিখা মেলিয়া সে দিব্য দেহ ভস্মীভূত করিল। সব শেষ হইল।

এই দুইটি বীর হৃদয়ের আত্মোৎসর্গে বাঙ্‌লার বৃহৎ প্রাণে একটা সাড়া আসিয়াছে। বাঙালী আজ শিখিতেছে, তাহার ন্যায্য অধিকারের জন্য, তাহার মাতৃজাতির মর্য্যাদার জন্য, কেমন করিয়া হাসিতে হাসিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হয়। বাঙলার এত বড় দুর্দ্দিনে আজ বাঙ্‌লার তরুণকে চন্দ্রকান্ত ও যতীন্দ্র-নাথের আদর্শ মাথায় লইয়া জীবন-যাত্রায় আগুয়ান হইতে হইবে। আজ বাঙ্‌লার ঘরে ঘরে, মায়েদের কোলে কোলে, এমনতর বীর বালক যে বড় দরকার।



প্রাচীন বাঙ্‌লার সমুদ্রগামী জাহাজ

বাঙ্‌লার নৌ-শক্তি ও উপনিবেশ

নদীমাতৃক বলিয়াই বাঙ্‌লাদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতে নৌ-শক্তি একটি বিশিষ্ট রূপ লইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙালী নৌ-শক্তির সহায়ে বিক্ষুব্ধ ঊর্ম্মিমালার মাথায় নাচিতে নাচিতে দেশ-বিদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করিয়াছে, রণতরীর সহায়ে রাজ্য জয় করিয়া ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছে, বাহুবলে বিদেশে আপনার অধিকার স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিয়াছে। সাহসিক বাঙালী রণতরী সহায়ে সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এসিয়াখণ্ডে যে বৃহত্তর বাঙ্‌লা গড়িয়া তুলিয়াছিল, নিজেদের শিক্ষা-দীক্ষা, সাধনা ও সভ্যতা দান করিয়া সুদৃঢ় করিয়াছিল, তাহা এখনও সে দেশে জীবিত রহিয়াছে, গ্রহীতা সে কথা ভুলিতে পারে নাই, দাতা হইয়া আমরা সে কথা বিস্মৃত হইয়াছি।

রঘুর দিগ্বিজয়ে বাঙালীর নৌ-বাহিনীর প্রথম পরিচয় পাই। রঘু সমস্ত দেশ জয় করিয়া বাঙ্‌লায় আসিলে বঙ্গীয় সেনা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিয়া ভীম বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিল। তাই আজও আমাদের কবি গাহিয়া থাকেন—

আমাদের সেনা যুদ্ধ করেছে সজ্জিত চতুরঙ্গে।
দশাননজয়ী রামচন্দ্রের প্রপিতামহের সঙ্গে॥

বৌদ্ধ যুগেই বাঙ্লার নৌ-শক্তি খুব প্রবল ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তৃতির ইতিহাসে বাঙালীর দান খুবই বেশী।

["The Pandits of Bengal became the Spiritual teachers of the Buddhist world. The Sovereign rulers of Eastern India, Tibet, Ceylon, and Subarnabhumi (modern Burma) vied with each other in showing veneration to them" Sarat Das.]

জিনমিত্র, বিক্রমপুরের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বরেন্দ্রের লামা তারানাথ, অতীশ ও ধর্ম্মপাল, বোধিধর্ম্ম, মঞ্জুশ্রী,বোধিসেন,রামচন্দ্র, কবি ভারতী,শান্তরক্ষিত প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রচারকগণ বাঙলার সাধনাকে বিদেশে ছড়াইয়া দিয়া জাতির গৌরব বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। নেপাল, তিব্বত, চীন, কোচিন-চীন, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, যাভা ও বলিদ্বীপে বাঙালীর কীর্ত্তি আজও জ্বলন্ত রহিয়াছে। খৃষ্টীয় শতাব্দীর প্রথম পাঁচ শত বছরেই বাঙালী বৌদ্ধ পণ্ডিতের দল জাপান ও কোরিয়ায় ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। জাপানের হোরিউসি বৌদ্ধ মন্দিরে (Horiusi Temple) যে হস্তলিখিত পুঁথি আছে উহা প্রাচীন বাঙলায় লেখা। প্রাচীন কালের সেই ধর্ম্মরাজ্যের রণ-অভিযান-গীতি আজিও আমাদের কবিকণ্ঠে গীত হইতেছে।—

"বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর।
'জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর॥"

এই যুগেই বাঙালী সিংহল যাত্রা করিয়াছে। বিজয়সিংহের নৌবাহিনী পনর শত লোক লইয়া সাগরের বুকের উপর দিয়া

ছুটিয়া গিয়াছে। বিজয়সিংহের একখানা অর্ণবপোতেই সাত শত আরোহীর স্থান হইয়াছিল। অন্য দুই খানি অর্ণবপোত বিজয়ের সহচরদিগের পরিবারবর্গ লইয়া গিয়াছিল। বিজয় লঙ্কায় পৌঁছিলে লঙ্কার মাটীতে বাঙালীর শক্তি-প্রতিষ্ঠা হইল। বৌদ্ধ-জাতকে অনেক বড় বড় জাহাজের উল্লেখ দেখা যায়। কোন জাহাজ এক হাজার এমন কি পনরশত লোক পর্য্যন্ত লইয়া চলাচল করিত। বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়াই অধিকাংশ জাহাজ যাতায়াত করিত।

বাঙ্‌লার সূত্রধরগণ এই সমস্ত অর্ণবযান নির্ম্মাণ করিত। নির্ম্মাণের কাঠও ব্রাহ্মণাদি চারি জাতিতে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে ক্ষত্রিয়জাতীয় কাঠই সমুদ্র গমনে ও যুদ্ধের জন্য নির্ম্মিত জাহাজের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল। ভোজের 'যুক্তিকল্পতরু' গ্রন্থে উপদেশ আছে, সমুদ্রগামী জাহাজের নিম্নদেশ কখনো লৌহদ্বারা বদ্ধ করিবেনা, কারণ জলমগ্ন পাহাড়ে প্রায়ই চুম্বক থাকে, উহার আকর্ষণে লৌহ খসিয়া যায়।

সেকালে সমরতরণীগুলি 'নৌবাট', 'নৌবাটক' বা 'নাবিতান' নামে পরিচিত ছিল। নৌসেনার অধ্যক্ষ নাবাধ্যক্ষ বা তরিক নামে খ্যাত ছিলেন। নৌসেতুর নাম ছিল নৌকামেলক, নৌযুদ্ধের নিনাদ হী হী রব। পোতনির্ম্মাণ স্থান "নাবতা-ক্ষেণী" নামে কথিত হইত।

খৃষ্টপূর্ব্বাব্দেই বাঙালীগণ এশিয়ার পূর্ব্বাঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। যবদ্বীপে এখনও হিন্দু দেবমূর্ত্তি আছে। সেকালে সুবর্ণগ্রাম হইতে জাহাজ যবদ্বীপে যাইত।

যবদ্বীপে মহিষাসুরমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি হিন্দুর ধর্ম্মপ্রচারের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়।

[Hindu sculpture has produced a masterpiece in the great stone altorelivo of Durga slaying the demon Mohisha found in Singasari in Java......It belongs to the period of Brahmanical ascendency in Java which lasted from A. D. 950 to 1500.—Havel.]

বাঙ্‌লার অপর কীর্ত্তি যাভার বরভূদরের বিশাল মন্দির ও কাম্বোজের ওঙ্কারধাম। শ্যাম, কাম্বোজ ও যাভার বহু প্রাচীন মূর্ত্তি, দেবমন্দির ও অট্টালিকা বাঙালীর গৌরবকাহিনীর সাক্ষ্য লইয়া আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে।

স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরভূদরের ভিত্তি।
শ্যাম কাম্বোজে ওঙ্কার ধাম মোদের প্রাচীন কীর্ত্তি॥
ধেয়ানের ধনে মূর্ত্তি দিয়াছে আমাদের ভাস্কর।
বিট্‌পাল আর ধীমান যাদের নাম অবিনশ্বর॥

ধীমান ও তৎপুত্র বিট্‌পাল বরেন্দ্রভূমির অধিবাসী ছিলেন। ইঁহারা চিত্রে এবং প্রস্তর ও পিত্তল ভাস্কর্য্যে নেপাল, চীন ও বৌদ্ধজগতে বাঙ্‌লার শিল্পকলার প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

[Artists & art-critics also see in the magnificent sculpture of the Borobudor temple in Java the hands of Bengali artists who worked side by side with the people of Kalinga & Guzrat in thus building up its early civilisation. And the numerous representations of ships which we find in the vast panorama of the bas-reliefs of

that colossal temple reveal the type of ships which the people of Lower Bengal built and used in sailing to Ceylon, Java, Sumatra, China and Japan in pursuit of their colonising ambition and commercial interest and artistic and religious missions—Indian Shipping (Mukerjee).]

বাঙালীর সিংহল-বিজয়ের পূর্ব্বেই চম্পার বাঙালীগণ কোচীন-চীনে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং নিজেদের জন্মভূমির নামানুসারে নূতন নগরের নামকরণ করেন।

হিন্দু-আমলে সকল রাজারই নৌসেনা ও নৌ-বাহিনী ছিল। পাল-রাজত্বে মহারাজ রামপাল নৌসেতু তৈরী করিয়া কৈবর্ত্ত-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন।

সেকালে বাঙালী সওদাগরগণ নানা দেশবিদেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন। চাঁদ, শ্রীমন্ত, ধনপতির কাহিনী আজ বাঙ্লার ঘরে ঘরে কীর্ত্তিত। চাঁদ যখন ঘোষণা করিলেন, বাণিজ্যে যাইবেন, দক্ষ শিল্পী কুশাইর ডাক পড়িল। কুশাই লোকজন লইয়া নৌকা নির্ম্মাণের কত রকম কাঠ কাটিয়া আনিলেন—

"শাল পিয়াল কাটে খরি তেতলি
কাটিল নিম্বের গাছ গাম্ভারি পারলি।
আম্র কাঠাল কাটে কাটয়ে বকুল
চম্পা খিরলি কাটি করিল নির্ম্মূল॥
চিরিয়া করিল ফালি লক্ষ তিন চারি॥"

সওদাগরের বাণিজ্য-যাত্রার কথা প্রাচীন কবি বলিতেছেন—

প্রথমে তুলিল ডিঙ্গা নাম মধুকর।
শুধাই সুবর্ণে তার বসিবার ঘর॥
আর ডিঙ্গা তুলিলেক নাম শঙ্খচূড়।
আশি গজ পাণি ভাঙ্গি গাঙ্গে লয় কূল॥

সেকালের সওদাগরগণ মূলার বদলে গজদন্ত লইতেন, শুক্তার বদলে মুক্তা পাইতেন, ভেড়ার বদলে ঘোড়া আনিতেন। এমনতর ছিল সেকালের বাণিজ্যের আদান-প্রদান। সেকালের বাণিজ্য-তরীর বড় সুন্দর কবিত্বপূর্ণ নাম ছিল। গঙ্গাপ্রসাদ, হংসরব, সাগরফেনা এই সব সেকালের নৌকার নাম।

মুসলমান আমলেও মোগলদের প্রবল নৌশক্তি ছিল। মোগল-সাম্রাজ্যের নৌয়ারা পোষণের জন্য কতকগুলি স্বতন্ত্র জায়গীর ছিল। ঢাকা, সমস্ত বাঙলার নৌয়ারার প্রধান কেন্দ্র ছিল। ঢাকা ব্যতীত হুগলী, বালেশ্বর, চিলমারী, যশোর প্রভৃতি স্থানেও নৌ-নির্ম্মাণ চলিত। সেকালে গৌড়,সাতগাঁ, চাটগাঁ প্রভৃতি বড় বন্দর ছিল। নিম্নবঙ্গে তখন এত অল্পব্যয়ে এমন সুদৃঢ় জাহাজ তৈরী হইত যে কনষ্টান্টিনোপলের সুলতান পর্য্যন্ত আলেক-জাণ্ড্রিয়া হইতে জাহাজ তৈরী না করিয়া এখান হইতে জাহাজ নির্ম্মাণ করাইয়া লইতেন।

ইহা ছাড়া মোগল আমলে প্রত্যেক ভূস্বামীই নৌবলে বলীয়ান্ ছিলেন। ইঁহাদের নৌশক্তির সহিত মোগল অশ্বারোহী কোন রকমেই সুবিধা করিতে পারিত না।

মহারাজ প্রতাপাদিত্যের সাগরদ্বীপ, জাহাজঘাটা, চকশ্রী, ঢুধলী প্রভৃতি স্থানে নৌবহরের আড্ডা ছিল। এই সকল স্থানে জাহাজ তৈরী এবং মেরামতও হইত। কেদারের রাজধানী শ্রীপুরে রণতরী প্রস্তুত হইত এবং জীর্ণতরীর সংস্কার সাধন হইত। সন্দ্বীপও তাঁহার নৌশক্তির একটি বড় আড্ডা ছিল।

লক্ষ্মণ-মাণিক্য, কন্দর্পনারায়ণ ও রামচন্দ্র রায় নৌযুদ্ধে পারদর্শী ছিলেন। কন্দর্পনারায়ণ ও তাহার পুত্র রামচন্দ্র নৌবলসহ মগ ও ফিরিঙ্গিদিগকে অনেকবার মেঘনার মুখের বস্তি হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহাঁদের সহিত মিত্রতা ঢাকার তদানীন্তন নবাবেরও ঈপ্সিত ছিল।

এই সময়কার যুদ্ধ-জাহাজগুলি নানা আকারের ও নানা রকমের ছিল। ইহাদের বিবিধ নাম ছিল—কোষ, জল্বা, ঘ্রাব, পরিন্দা, বাঁলাম, কার্ত্তুস, ঝাণ্ডার ইত্যাদি।

"পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নিকোলো কনিষ্ট নামক জনৈক য়ুরোপীয় পরিব্রাজক ভারতবর্ষ ভ্রমণে আগমন করেন। ভারতের বাণিজ্য ও নৌ-যানাদি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"ভারতের অধিবাসিগণ আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তর যানাদি নির্ম্মাণ করিতে পারদর্শী। তাহারা এত বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করিতে পারিত যে সেই অর্ণবপোতে এক একটি এগার বার মন মত্তে পূর্ণ দুই সহস্রাধিক পিপা সংবাহিত হইতে পারিত। সেই অর্ণবপোতে পাঁচটি করিয়া মাস্তুল ছিল এবং পাঁচখানি পাইলের সাহায্যে উহা পরিচালিত হইত। তিন প্রস্থ কাষ্ঠের দ্বারা সেই সকল পোতের

তলদেশ প্রস্তুত হইত। বিষম ব্যাতায় তরণী বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইলে, নির্ম্মাণ-কৌশলের গুণে উহা রক্ষা পাইত। কতকগুলি পোত এমনই সুকৌশলে নির্ম্মিত হইত যে তাহার একাংশ ভগ্ন হইলেও অপরাংশ অব্যাহত থাকিত এবং তৎসাহায্যে যাত্রিগণ রক্ষা পাইত।"

এমন কি গত শতাব্দীর প্রথম ভাগে একজন ফরাসীলেখক বলিয়াছেন—"নৌনির্ম্মাণ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুগণ উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, এখনও তাহারা য়ুরোপকে নৌশিক্ষার আদর্শ উপহার দিতে সমর্থ।"

তারপর ধীরে ধীরে নানাপ্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে বাঙ্‌লার এত-বড় একটা জাতীয় শিল্প ধ্বংস হইয়া গেল। সে ইতিহাস বড় করুণ, বড় বিষাদ-মাখা।

আজ এই সর্ব্বহারা নিঃস্ব বাঙ্‌লা মায়ের শীর্ণ মুখের দিকে চাহিয়াই বাঙালী কবি ক্ষুব্ধপ্রাণে আশ্বাস-বাণী গাহিয়াছেন—

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়,
একদা যাহার অর্ণবপোত ভ্রমিল ভারত সাগরময়,
সন্তান যার তিব্বত চীন জাপানে গঠিল উপনিবেশ,
তুই কিনা মাগো তাদের জননী তুই কিনা মাগো তাদের দেশ!

বাঙ্‌লার লাঠি ও লাঠিয়াল

বাঙালী যখন আত্মরক্ষার শেষ অবলম্বন অসিচর্ম্মও হারাইয়া বসিল, তখন বাঙালীর বীরত্ব লাঠিকে আশ্রয় করিল। লাঠির ডাকে বাঙালীর বীরত্ব-গাথা ঝঙ্কারিয়া উঠিল। আগেকার দিনের মত বন্দুক-তলোয়ারের বদলে বাঙালীর পাড়ায় পাড়ায় আবার ছেলে-বুড়া সকলে মিলিয়া লাঠির কসরৎ শিখিল, লাঠির কৃত্রিম যুদ্ধ (mock fight) করিল। দেখিতে দেখিতে সারা বাঙ্‌লা জুড়িয়া সুশিক্ষিত লাঠিয়ালের দল সৃষ্ট হইল। ইহাদের সাহসিকতা, শৌর্য্য-বীর্য্য ও রণকুশলতা দেখিয়া আজিও বিস্ময়ে অভিভূত হইতে হয়।

বিক্রমপুরের যুদ্ধের পর মানসিংহ কেদারের রাজ্য তাঁহার প্রধান অমাত্য রঘুরামের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। রঘুরামের বহুবলশালী লাঠিয়াল সর্দ্দার রামমালিকের কথা আজও লোকের মুখে মুখে কিংবদন্তীতে জীবিত রহিয়াছে। রামমালিক নামকরা সাহসী যোদ্ধা ছিলেন। আজও তাহার লাঠির নিপুণতার কাহিনী লোকে গাহিয়া থাকে।—

রামমালিকের লাঠি।
রঘু রায়ের মাটি॥
উঠ্‌লে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পালায় বাঘ॥

গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে॥
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাঁটি॥”

এমন কত রামমালিক সেকালের বাঙ্‌লার পাড়ায় পাড়ায় বিরাজ করিত।

নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে দেশ যখন উচ্ছন্ন যাইতে বসিয়াছিল, প্রজার ধন-দৌলত, মান-ইজ্জত যখন নীলকরের খেয়ালের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন এই নির্য্যাতিত, উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত জনসাধারণ লাঠিকে ভরসা করিয়া কুঠিয়াল নীলকর সাহেবদিগের ফৌজের সহিত কত না খণ্ডযুদ্ধ করিয়া রক্ত-রাঙা লাঠির জোরে ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছে। হায়! সে সব কথা ভুলিয়া গিয়া আমরা আজ আয়র্লণ্ডের খণ্ডযুদ্ধের কথা ভাবিয়া বিস্মিত হই। স্বদেশের মাঠিতেই যে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা একযুগে লাঠির আগে অত্যাচারীর বুকে আতঙ্কের গভীর রেখা আঁকিয়া দিত, কই সে কীর্ত্তি-কথা ত একবারও স্মরণ হয় না?

আবার যখন পূর্ব্বোত্তর বঙ্গে প্রজা-বিদ্রোহের বিপ্লব-কাহিনী শুনিতে পাই, যাহার প্রভাব জমিদারকে বিনিদ্র রাখিত, রাজপুরুষ-গণকে উৎকণ্ঠিত করিত, তখনও দেখি সে রক্ত-রাঙা লাঠিই তাহাদের হস্ত-বিধৃত রহিয়াছে। লাঠির সহায়তার এই সব বিদ্রোহী কৃষাণের দল আপনাদের অভাব-অভিযোগের মীমাংসা করিয়া

লইত। তাহাদের সংহত শক্তির নিকট প্রবল রাজশক্তিও অবনত হইত। ইহারা সুশিক্ষিত ফৌজের সহিত রীতিমত যুদ্ধ দিত এবং জয়পরাজয় সমভাগে ভাগ করিয়া নিত।

কোম্পানীর আমলে এই লাঠির অপ্রতিহত প্রভাব ছিল। লাঠির এই অসীম ক্ষমতা লক্ষ্য করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—

"হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারী দুই টুক্‌রা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ। হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালার আব্রু পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। বদমাইস তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল, তুমি তখনকার পীনালকোড ছিলে।"

অবশেষে আত্মরক্ষার শেষ অবলম্বন লাঠিখানা আশ্রয় লইয়াছে পদ্মা, ধলেশ্বরী, মেঘনার তীরে আর চড়ে— কৈবর্ত্ত, কৃষক মুসলমান, বাগ্দী ও নমঃশূদ্রের সবল হস্তে।

তারপর, অনেকদিন পরে বাঙালীর মুক্তি-চেতনা যেদিন জাগ্রত হইল, সেই স্বদেশীর যুগে ৺নবগোপাল মিত্র প্রমুখের উদ্যোগে "হিন্দু-মেলা"ই সর্ব্বপ্রথম লাঠিখেলা প্রভৃতি জাতীয় ব্যায়ামগুলির চর্চ্চা প্রচলন করেন।

আশার কথা, আমরা ইহারই মধ্যে একদল শিক্ষিত-ভদ্র লাঠিয়ালও পাইয়াছি। ইহাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাস, ৺অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ননীলাল বসু প্রভৃতি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা লাঠির খেলাকে বেশ নিয়মবদ্ধ ভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে নূতন রূপ দিয়া দাঁড় করাইয়াছেন। বিশেষতঃ পুলিনবাবু ছোট লাঠি খেলাটাকে সুন্দরভাবে প্রকাশিত করিয়া এই পৌরুষজনক ব্যায়াম-ক্রীড়ার প্রচলনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন। ইহাঁদের সুযোগ্য শিষ্যগণ নানা স্থানে লাঠির চর্চ্চা দ্বারা জাতিকে সবল ও সাহসী করিয়া তুলিতেছেন।

বাঙ্‌লার কামান ও গোলন্দাজ

সে যুগে বাঙালীর মুক্তি-স্পৃহা শুধু সঙ্গীন আর তলোয়ার-ফলকেই প্রকাশ পায় নাই, শত শত হিন্দু-গড় হইতে কামানের গুরু-গম্ভীর নিনাদে উহা ঘোষিত হইয়াছিল। বাঙালীর তখন গড় ছিল—বাঙ্‌লা দেশ-জোড়া অসংখ্য গড় সমতলবাসী বাঙালীকে রক্ষা করিত, বাঙ্‌লার কর্ম্মকারগণ বড় বড় কামান নির্ম্মাণ করিয়া আত্মরক্ষার উপায় করিতেন, বাঙালী গোলন্দাজ সেনার আক্রমণ-কৌশলে শত্রুদল আতঙ্কিত হইত। বাঙালী গোলন্দাজ সেনা সেকালে হিন্দুস্থানে নৈপুণ্যের জন্য সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। সেই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোগল-বাদশাহ বাবর পর্য্যন্ত বাঙালী গোলন্দাজদিগের রণ-নৈপুণ্যে মুগ্ধ হইয়া তাহাদের প্রশংসা স্বীয় আত্মজীবনীতে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"The Bengalees are famous for their skill in artillery; on this occasion we had a good opportunity of observing them."

—"বাঙালীরা কামান দাগিতে সুনিপুণ ও সুবিখ্যাত। এই ব্যাপারে বাঙালী গোলন্দাজদিগের নিপুণতা প্রত্যক্ষ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।"

বারভূঞার যুগে প্রত্যেক বড় বড় ভূঞার দুর্গসমূহ কামান-রক্ষিত থাকিত। কেদারের রাজধানী শ্রীপুরে কামানাদির নির্ম্মাণ-

কার্য্যও চলিত। মহারাজ প্রতাপাদিত্যের দুর্গসমূহের অগ্নি-উদ্গারী কামানসমূহ শত্রুসেনা বিধ্বস্ত করিয়া ছাড়িত। রাজা সীতারাম রায় স্বহস্তে কামান দাগিয়া শত শত শত্রুসেনা যমদ্বারে পাঠাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুর ও চন্দ্রদ্বীপের রাজাদের ধ্বংসাবশিষ্ট রাজবাড়ীতে পরিত্যক্ত কামান এখনও তাঁহাদের শৌর্য্যের পরিচয়ই প্রদান করে। ঈশাখাঁর কামানগুলিও বাঙালীরই অক্ষয়-কীর্ত্তি।

যেদিন বাঙালীর মুক্তি-পতাকা অবনত হইল, সেদিনও বাঙালী গোলন্দাজ সেনা মোগলের পাশে দাঁড়াইয়া কামান দাগিয়াছে, তখনও বাঙালী কর্ম্মকারই মোগলের কামান গড়িয়াছে। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরে তখন কামান নির্ম্মাণের আস্তানা ছিল। মুর্শিদাবাদের মাইল-খানেক পূর্ব্বে মুর্শিদকুলিখাঁর তোপ-খানা ছিল। এখানে এখনও একটি কামান সেকালের হিন্দু কর্ম্মকারের কামান-নির্ম্মাণের বৃদ্ধ-সাক্ষী-স্বরূপ বসিয়া আছে। ইহার নাম জাহানকোষা (জগজ্জয়ী)। "কামানটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১০ হাত হইবে, বেড় তিন হাতের অধিক, মুখের বেড়টি ১ হাতের উপর। অগ্নি-সংযোগ-ছিদ্রের ব্যাস দেড় ইঞ্চি হইবে।" ইহার গাত্রে লিখিত আছে যে, "ইহা বাদসাহ সাজাহানের রাজত্বকালে ও ইস্‌লামখাঁর শাসনসময়ে জাহাঙ্গীরনগরে (ঢাকায়) দারোগা শের মহম্মদের অধীন হরবল্লভ দাসের তত্ত্বাবধানে জনার্দ্দন কর্ম্মকার কর্ত্তৃক ১০৪৭ হিঃ ১১ই জমাদিয়সসানি মাসে নির্ম্মিত হয়। ওজন ২১২ মণ; ইহাতে ২৮ সের বারুদ লাগিয়া থাকে। ঢাকায় ইহা অপেক্ষা আরও একটি বিশাল তোপ ছিল, তাহা এক্ষণে নদী-

গর্ত্তে পতিত।" ঢাকায় সেকালের তৈরী আর একটি কামান এখনও নদীর পাড়ে "চিত্তরঞ্জন এভেনিউ"এর মুখে স্থাপিত রহিয়াছে। নবাব সিরাজদ্দৌলার অনেকগুলি খুব বড় বড় কামান ছিল। সেগুলিও আমাদের স্বদেশীয় কর্ম্মকারদিগের তৈরী। কলিকাতা ও কাশিমবাজার অবরোধের পর কোম্পানি কতকগুলি ফিল্ডপিস (Field-piece) আনিয়াছিলেন। সেই বিলাতী ফিল্ডপিসগুলির অনুকরণে ২০টি কামান আমাদের কারিগরগণ এমন নিপুণভাবে গড়িয়াছিলেন যে একস্থানে রাখিলে আসল নকল বুঝা যাইত না। সেকালের কামান শুধু লোহায় নির্ম্মিত হইত না, পিত্তলেও হইত।

বাঙালী গোলন্দাজ শ্যামসুন্দরের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। শ্যামসুন্দর যেমন নির্ভয়ে নিপুণতা সহকারে কামান দাগিয়া শওকতের সেনাদলকে উদ্দীপিত ও উৎসাহিত করিয়াছিলেন সেরূপ দৃষ্টান্ত বিরল।

তারপর যেদিন বাঙ্‌লার রাজলক্ষ্মী মোগলকে ত্যাগ করিয়া শ্বেতাঙ্গের অঙ্কশায়িনী হইলেন সেদিন হইতে বাঙালী আর কামান দাগিবার অবসর পাইল না, কামান তৈরীর অধিকার তাহার লুপ্ত হইল, বাঙালীর গোলন্দাজি বাস্তবতা ছাড়িয়া ইতিহাসে আশ্রয় লইল। কিন্তু পরবর্ত্তী যুগে যখনই সে সুযোগ ও সুবিধা পাইয়াছে, অমনি তাহার সুপ্ত প্রতিভা স্ফুরিয়া উঠিয়াছে। তাই দেখিতে পাই জাহানকোষা-নির্ম্মাতা জনার্দ্দন যেন নূতন দেহে মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে ক্যাপ্তান রাজকুমার কর্ম্মকারের ভিতর দিয়া। রাজকুমার

নেপাল ও কাবুলে, আধুনিক উন্নত প্রণালীর বন্দুক, কামান, কামানের গাড়ী, নানাবিধ কলকারখানা এবং এমন কি মেসিন্‌গান পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়া বাঙালীর পূর্ব্ব কীর্ত্তির স্মৃতিরক্ষা করিয়াছেন। নেপালরাজ অস্ত্র-নির্ম্মাণ-নিপুণতার জন্য রাজকুমারকে কাপ্তান উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। আফগান আমির তাঁহাকে কত প্রশংসা করিয়াছেন। বাঙালীর বিচিত্র প্রতিভা দেখিয়া মনে হয় কবির সেই ভবিষ্যৎ বাণী—

(আবার) আসিবে সে দিন আসিবে।

পুরাণেতিহাসে বাঙালীর কথা

রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণাদি সেকালের ইতিহাস—এই সকল গ্রন্থ শত শত সমৃদ্ধ রাজ্য, সম্ভ্রান্ত রাজন্যবৃন্দ ও শক্তিমান্ বীরপুরুষদের শৌর্য্য-বীর্য্যের কীর্ত্তি-কথায় পরিপূর্ণ। তাহাতে বাঙ্লা দেশ ও বাঙালীদের কথা কিছু আছে কি? দ্রৌপদীর স্বয়ংবরে, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে, ভারতের বীরেন্দ্রবৃন্দের মহাসম্মেলন ঘটিয়াছিল। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভারতের সমস্ত রাজন্যবৃন্দ যোগ দিয়াছিলেন। মহাভারতে লেখা আছে—'তৎকালে বোধ হইল যেন ভারতবর্ষ পুরুষশূন্য হইল, সর্ব্বত্রই বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীগণ মাত্র অবশিষ্ট রহিল।' তখন বাঙালীরা কোথায় ছিল? তখন বাঙলা দেশও কি পুরুষশূন্য হইয়াছিল? বাঙলা দেশ, বাঙলার রাজা, বাঙালী জাতি কি তখন ছিল?

ছিল। দেশও ছিল, জাতিও ছিল, দেশে পরাক্রান্ত রাজাও ছিলেন, শক্তিমান্ সৈন্যসামন্তও ছিল। বাঙলার রাজা, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ-সভায় সমবেত অন্যান্য নৃপতিবৃন্দের ন্যায়ই সমভাবে সম্মান-সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। এই দেশের রাজপুত্র—'সমুদ্রসেনপুত্রশ্চ চন্দ্রসেনঃ প্রতাপবান্'—দ্রৌপদীর স্বয়ংবর সভায় উপস্থিত ছিলেন, কেবল দর্শকরূপে নহে, কর্ণ দুর্য্যোধন শল্য শাল্ব প্রভৃতি খ্যাতনামা বীরবৃন্দের সহিত 'ওষ্ঠাধর স্ফুরণ পূর্ব্বক' লক্ষ্য ভেদার্থ ব্যর্থ বিক্রম প্রকাশ করিতেও ক্রটী করেন নাই। সেকালের বাঙালীরা মথুরা আক্রমণ করিয়াছিলেন, দ্বারকা অবরোধ করিয়াছিলেন, কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধে অসীম বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তাহারা দিগ্বিজয়ী ভীমসেনকে প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, রঘু রাজার সহিত নৌযুদ্ধ করিয়াছিলেন, রঘুর বাইশ পুরুষ ঊর্দ্ধতন সগর রাজার যজ্ঞাশ্ব আটক করিয়াছিলেন।

সেকালের বাঙ্‌লা ও বাঙালী

এই দেশ, এই জাতি অতি প্রাচীন, তবে বাঙ্‌লা ও বাঙালী নাম আধুনিক। প্রাচীন কালের বঙ্গরাজ্য আধুনিক বাঙ্‌লা প্রেসিডেন্সীর একাংশ মাত্র, ইহার মধ্যভাগে অবস্থিত ছিল। মহাভারতীয় যুগে বঙ্গাধিপ ছিলেন সমুদ্রসেন ও তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন। বঙ্গরাজ্যের পূর্ব্বে ছিল সমৃদ্ধ কামরূপ রাজ্য বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ। এই রাজ্য উত্তরে চীন ও দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগের কতকাংশ এবং উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ সেকালে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তখন এই দেশের রাজা ছিলেন মহাবীর ভগদত্ত। মহাভারতে উল্লিখিত আছে যে তাঁহার সৈন্যগণের মধ্যে চীন, কিরাত এবং সাগরতীরস্থ অনূপদেশবাসী বহু সংখ্যক যোদ্ধা ছিল। এই 'অনূপদেশবাসী' যোদ্ধারা পূর্ব্ববঙ্গের বাঙালী সেনা। 'বাঙালেরা' চিরকালই শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য প্রসিদ্ধ। তখন এই 'বাঙাল' দেশের কতকাংশ ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ এবং কতকাংশ পৌণ্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পৌণ্ড্র রাজ্য ছিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমে, উহা উত্তরে কিরাত রাজ্য ও পশ্চিমে অঙ্গরাজ্য (ভাগলপুর) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বর্ত্তমান সমগ্র রাজসাহী বিভাগ উহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। উহার রাজা ছিলেন সুবিখ্যাত পৌণ্ড্রক বাসুদেব। উহার দক্ষিণ-পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য (বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী ও ঢাকা বিভাগের কতকাংশ) এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল সুহ্ম রাজ্য (বর্দ্ধমান বিভাগ), উহার দক্ষিণে ছিল তাম্রলিপ্ত। পূর্ব্বে এই সকল রাজ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ছিল। পরে উহারা এক অখণ্ড শাসনতন্ত্রের অধীন হইয়া গৌড়বঙ্গ বা গৌড় সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়। মোগল রাজত্ব কালে মিলিত গৌড়বঙ্গ বাঙ্‌লা নামে অভিহিত হয়, তদবধি উহার অধিবাসীরা বাঙালী নামে পরিচিত। এখনও সমগ্র বাঙালী জাতি

বাঙ্‌লা দেশের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, আসামের শ্রীহট্ট অঞ্চলের এবং বিহার ও উড়িষ্যার প্রান্তভাগের অধিবাসীরা বাঙ্গালী হইলেও ভিন্ন প্রদেশের অন্তর্গত।

কাছাড় হইতে কাসাই নদী পর্য্যন্ত এবং তিস্তা নদী হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডের অধিবাসীর মাতৃভাষা বাঙ্‌লা ভাষা, ইহারা সকলেই বাঙালী। এই আর্য্যভাষা-ভাষী বাঙালী জাতিটা সেই প্রাচীন যুগে বিভিন্ন রাজ্যে বাস করিত। তন্মধ্যে বঙ্গ, পৌণ্ড্র, প্রাগ্‌জ্যোতিষ, সুহ্ম, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি প্রধান। সুতরাং সেকালের বাঙ্‌লার ইতিহাস এই সকল রাজ্য ও রাজাদের ইতিহাস। মহাভারত, হরিবংশ, পুরাণাদি গ্রন্থ বাঙ্‌লার এই সকল রাজাদের ও তাঁহাদের সৈন্যসামন্তের শৌর্য্যবীর্য্যের সুদীর্ঘ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সে ইতিহাস বাঙ্‌লার গৌরবের ইতিহাস। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহার কয়েকটী কথা এস্থলে উল্লেখ করিতেছি।

মথুরা অভিযানে বাঙালী

সে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বকার কথা। তখন মগধে জরাসন্ধ নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। পৌণ্ড্ররাজ বাসুদেব, বঙ্গাধিপ সমুদ্র সেন, প্রাগ্‌জ্যোতিষ-পতি ভগদত্ত প্রভৃতি বাঙ্‌লার রাজারা সকলেই জরাসন্ধের সহিত মিত্রতা পাশে আবদ্ধ ছিলেন। মথুরার কংস ছিলেন জরাসন্ধের জামাতা। ইনি পিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া নিজে সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ মল্লযুদ্ধে ইহাকে নিহত করিয়া উগ্রসেনকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাহাতে জরাসন্ধ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার অধীন সামন্তরাজ ও মিত্ররাজগণ সহ ভীম বিক্রমে মথুরা আক্রমণ করেন। গান্ধার-রাজ সুবল, কাশ্মীর-রাজ গোনর্দ্দ, হস্তিনাপুরের দুর্য্যোধন, অঙ্গরাজ কর্ণ, মদ্ররাজ, ত্রিগর্ত্তরাজ, শল্যরাজ, এবং কাশী, কোশল, বিদেহ প্রভৃতি দেশের

পরাক্রান্ত রাজগণ সকলেই জরাসন্ধের পতাকাতলে সমবেত হইয়াছিলেন। এই মহারাজসম্মেলনে এদেশের 'বীর্য্যবান্' ভগদত্ত, 'বলিনাং বরঃ' পৌণ্ড্রাজ বাসুদেব এবং বঙ্গাধিপও যোগদান করিয়াছিলেন। অবশ্য ইহারা নিজেদের সৈন্য সমস্ত লইয়াই মথুরা আক্রমণে গিয়াছিলেন। সে সৈন্য ছিল কাহারা?—পশ্চিম বঙ্গ, উত্তর বঙ্গ, পূর্ব্ব বঙ্গ ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি জিলাবাসী বাঙালী সেনা।

এই সকল প্রবল পরাক্রান্ত রাজন্যবৃন্দের সহায়ে জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করেন। এইরূপে পুনঃ পুনঃ উত্যক্ত হইয়া পরিশেষে যাদবেরা শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে মথুরা পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে সাগরতীরে দ্বারকায় যাইয়া সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করেন।

দ্বারকা অবরোধে বাঙালী

বাঙ্লার রাজা পৌণ্ড্রক বাসুদেব, একলব্য প্রভৃতি সামন্ত রাজগণ সহ অসংখ্য সৈন্য লইয়া দ্বারকা নগরও অবরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই চতুরঙ্গ সেনা-সমন্বিত বিশাল বঙ্গবাহিনীর যে বিস্তৃত বর্ণনা প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়, তাহা পাঠ করিলে বাঙালীর হৃদয় গর্ব্ব ও বিস্ময়ে আপ্লুত হইয়া উঠে। সেই বাহিনীতে অষ্টসহস্র রথ, দশ সহস্র হস্তী, বহু সহস্র অশ্ব, লক্ষ লক্ষ পদাতিক সেনা ছিল। তাহারা শক্তি, তোমর, পাশ, প্রাস, বজ্র, গদা, পরিঘ, পট্টিশাদি বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। শঙ্খ, ভেরী, পণব, পটহাদির ঘোর নিনাদে যুগান্তকালীন জলদের ন্যায় দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ('মহাঘোরং মহারৌদ্রং যুগান্তজলদোপমং') লক্ষ লক্ষ দীপিকা হস্তে চলন্ত অগ্নিকুণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান সেই বিশাল বঙ্গ-বাহিনী ঘোর অন্ধকার রজনীতে যাইয়া দ্বারকা নগরী অবরোধ করিল।

এই বাসুদেবের পুত্র সুদেব একাই অক্ষৌহিণী সেনার নায়ক ছিলেন।

('পৃথগক্ষৌহিণী পতি')। ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব এবং ১০৯৩৫০ পদাতিক সৈন্যের যিনি নায়ক তাহাকেই অক্ষৌহিণীপতি বলে। অবশ্য পৌরাণিক আখ্যান অনেক স্থলে অতিরঞ্জিত, কিন্তু এই সকল বর্ণনা হইতেই বুঝা যায় সেকালের বাঙালী রাজাদের সৈন্যবল, পরাক্রম ও ভারতের রাজেন্দ্র সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি কতটা ছিল।

ভীমার্জ্জুনের সহিত বাঙালীর যুদ্ধ

এই সময়ে ইন্দ্রপ্রস্থে পাণ্ডবরাজ যুধিষ্ঠির ভ্রাতৃগণ সহ রাজত্ব করিতেন। তিনি রাজসূয় যজ্ঞ করিবার মনস্থ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, আপনার সঙ্কল্প উত্তম, আপনার ভ্রাতারাও বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু আপনি ত রাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট্ নহেন। সম্প্রতি ভারতের সম্রাট্ জরাসন্ধ, তাহার অত্যাচারে বহু রাজা পরাভূত, রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইয়াছেন, ৮৬ জন কারারুদ্ধ আছেন, শত সংখ্যা পূর্ণ হইলে ইহাদিগকে বলি দান করা হইবে। পূর্ব্বাঞ্চলে বাসুদেব, ভগদত্ত, বঙ্গাধিপ প্রভৃতি পরাক্রান্ত রাজগণ তাহার সহিত মিত্রতা পাশে আবদ্ধ আছেন। ইহাদিগের আক্রমণে তিষ্ঠিতে না পারিয়া আমরা দ্বারকায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছি। ইহাদিগকে করায়ত্ত করিতে না পারিলে রাজসূয়-যজ্ঞের সঙ্কল্প আকাশ-কুসুম মাত্র।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে ও সহায়তায় ভীমসেন মল্লযুদ্ধে জরাসন্ধকে নিহত করেন। তারপর চারি ভ্রাতা চারিদিকে দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হন। ভীমসেন অগণিত সৈন্য সহকারে পূর্ব্বদিকে ধাবিত হইলেন। তখন মগধে জরাসন্ধ নিহত হইয়াছেন। তাহার দক্ষিণহস্ত ছিলেন চেদিরাজ শিশুপাল, তিনি ভীমসেনের বিরুদ্ধাচরণ করিলেন না, যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিয়া রাজসূয়-যজ্ঞের সাধু সঙ্কল্প অনুমোদন

করিলেন। তৎপর ভীমসেন পূর্ব্বদিকে আসিয়া 'ভীমবিক্রম বলভৃৎ' হুগলীর রাজা মহৌজা, পুণ্ড্ররাজ বাসুদেব ও বঙ্গরাজ সমুদ্রসেন প্রভৃতিকে একে একে আক্রমণ করেন। ইহারা একতাবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রতিরোধ করিলেন না, প্রত্যেকেই একা একা যুদ্ধ করিয়া শেষে দিগ্বিজয়ীর আনুগত্য স্বীকার করিলেন। দিগ্বিজয় অর্থ সেকালে পররাষ্ট্র অধিকার করা বুঝাইত না, উহার উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র রাজন্যবর্গের উপর সম্রাটের আধিপত্যের নিদর্শনস্বরূপ কিছু কর প্রদানে বাধ্য করান। এই নামে-মাত্র অধীনতাটুকুও বাঙ্‌লার রাজারা বিনাযুদ্ধে স্বীকার করেন নাই।

ওদিকে উত্তরদিক্ হইতে আসিয়া অর্জ্জুন প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর আক্রমণ করিলেন, রাজা ভগদত্তের সহিত তাঁহার তুমুল যুদ্ধ বাধিল। "ঐ নরেশ্বর অষ্টাহ যুদ্ধের পর ধনঞ্জয়কে সহাস্যবদনে এই কথা বলিলেন, তুমি পাক-শাসনের আত্মজ, এতাদৃশ বীর্য্য প্রকাশ তোমার উপযুক্তই বটে, এক্ষণে তোমার অভিপ্রায় কি বল।" অর্জ্জুন বলিলেন—'আপনি আমার পিতৃসখা, আপনাকে আমি আদেশ করিতে পারি না, রাজা যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য লাভ আমাদের অভিপ্রায়, আপনি প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহাকে কিছু কর প্রদান করুন।"—মহাভারত।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বাঙালীর কীর্ত্তি

এইরূপে পাণ্ডবেরা ভারতের সমস্ত রাজন্যবৃন্দকে করায়ত্ত করিলে মহারাজ যুধিষ্ঠির মহাসমারোহে রাজসূয়-যজ্ঞ সমাপন করেন। আমরা দেখিতে পাই, সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রিত নৃপতি-সমাজে এদেশের বঙ্গাধিপ, পুণ্ড্রাধি-পতি প্রভৃতিও উপস্থিত ছিলেন। ইহার পর দুর্য্যোধনের জ্ঞাতি-বিদ্বেষ ও শকুনির কূটবুদ্ধি পাণ্ডবগণকে রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত করিল। দুর্য্যোধন

যুধিষ্ঠিরের সাম্রাজ্য গ্রাস করিয়া বসিলেন, ভীমার্জ্জুনের বাহুবলে যে সকল রাজন্যবৃন্দ যুধিষ্ঠিরের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহারা অনেকেই দুর্য্যোধনের সহিত আবার মিত্রতাবদ্ধ হইলেন। কুরুক্ষেত্রে অধিকাংশ রাজাই দুর্যোধনের পক্ষে ছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত, বঙ্গাধিপ, পৌণ্ড্রাজ, তাম্রলিপ্তপতি—ইহারা সকলেই সসৈন্যে দুর্য্যোধনের পক্ষে যোগদান করিয়াছিলেন। সেই অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী যোদ্ধগণের মধ্যে যাহারা অসাধারণ শৌর্য্যবীর্য্য প্রদর্শন করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহাদেরই বর্ণনা মহাভারতে পাওয়া যায়। উহাতে আমাদের বাঙালী রাজাদের ও তাঁহাদের সৈন্যবৃন্দের অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী নানাস্থানে উজ্জ্বল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। আমরা অতি সংক্ষেপে দুই একটী ঘটনা মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

"ভীমসেন-পুত্র রাক্ষস ঘটোৎকচ মহাশব্দ করিয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নানা অস্ত্র-শস্ত্রধারী রাক্ষস-পুঙ্গবগণে পরিবৃত হইয়া কালান্তক যমের ন্যায় উপস্থিত হইল। তাঁহার সেই ভীষণ শব্দ শুনিয়া কুরুপক্ষের সৈন্যগণ সিংহভীত হস্তীর ন্যায় দীনচিত্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিচেষ্টমান হইল। রাজা দুর্যোধন স্বীয় সৈন্যগণকে তাহার ভয়ে বিমুখীকৃত দেখিয়া মুহুর্ম্মুহু সিংহনাদ করত বিপুল ধনুক গ্রহণ পূর্ব্বক ঘটোৎকচের প্রতি ধাবমান হইলেন। বঙ্গাধিপতি স্বয়ং দশ সহস্র কুঞ্জর সৈন্যের সহিত রাজা দুর্য্যোধনের অনুগামী হইলেন। তৎপর রাক্ষসগণের সহিত বঙ্গীয় গজসৈন্যের লোমহর্ষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তাহারা শর, শক্তি, ঋষ্টি, নারাচ দ্বারা গজযোধিগণকে এবং ভিন্দিপাল, শূল, মুদ্গর ও বৃক্ষ-প্রস্তরাদি দ্বারা বৃহৎ বৃহৎ হস্তীকে প্রহার করিতে লাগিল। রাজা দুর্য্যোধন পঞ্চবিংশতি সংখ্যক সুতীক্ষ্ণ শাণিত নারাচ ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। রাক্ষসপ্রবর ঘটোৎকচ তাহাতে বিদ্ধ হইয়া রক্তস্রাব করিতে করিতে দুর্য্যোধনের বধ-বাসনায়

প্রজ্জ্বলিত অশনি সদৃশ মহোল্কাভাসম্পন্ন এক মহাশক্তি সমুদ্যত করিল। বলশালী বঙ্গাধিপ সেই সুপ্রদীপ্ত মহাশক্তিকে সমুদ্যত দেখিয়া পর্ব্বত সদৃশ এক কুঞ্জরে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে আসিয়া দুর্য্যোধনের রথের সম্মুখে উপনীত হইয়া রথ সমাবৃত করিলেন। ঘটোৎকচের নিক্ষিপ্ত সেই মহাশক্তি বঙ্গরাজের হস্তীর উপরে পতিত হওয়াতে হস্তী রুধির বমন করিতে করিতে ভূপতিত হইল ও প্রাণত্যাগ করিল। ঠিক সেই সময় মহাবলী বঙ্গেশ্বর সবেগে লম্ফ প্রদান করিয়া ধরণীতলে অবতীর্ণ হইলেন।" —মহাভারত।

এস্থলে দেখিতেছি, রাজা দুর্য্যোধনের স্বীয় সৈন্যগণ যখন চতুর্দ্দিকে পলায়মান হইল তখন বঙ্গাধিপ স্বয়ং হস্তীসৈন্য সহ তাঁহার অনুগামী হইলেন, যখন ঘটোৎকচ দুর্য্যোধনকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়া ভীষণ শক্তি অস্ত্র সমুদ্যত করিল, তখন বঙ্গরাজ নিজ প্রাণ তুচ্ছ করিয়া সেই ভীষণ শক্তি অস্ত্রের সম্মুখীন হইয়া রাজাকে রক্ষা করিলেন। আবার সেই অস্ত্রে তাঁহার হস্তী নিহত হইবামাত্র ক্ষিপ্র-কৌশলী বীরবর লম্ফ প্রদানে ভূতলে অবতরণ পূর্ব্বক আত্মরক্ষা করিলেন। এমন অপূর্ব্ব বীরত্বকাহিনী যে-কোন জাতির ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখার যোগ্য। কিন্তু তথা-কথিত বাঙলার ইতিহাসে বাঙালীর চিত্র অন্যরূপে চিত্রিত, তাহার কারণ, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় 'শত্রুহস্তে চিত্রফলক'।

ইহার পর ভীষ্মদেবের আদেশে দ্রোণ, ভূরিশ্রবা, কৃপ, শল্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি মহারথগণ দুর্য্যোধনের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। কিন্তু তাঁহারা সকলেই ক্রমে ক্রমে আহত হইয়া পড়িলেন, 'সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামে ধৃতরাষ্ট্রীয় মহৎ সৈন্য প্রায় বিমুখীকৃত হইল।' তখন ভীষ্মদেব প্রাগ্জ্যোতিষ-পতি ভগদত্তকে বলিলেন—'হে মহারাজ, আপনি যুদ্ধ-দুর্ম্মদ হিড়িম্বা-নন্দনের নিকট গমন করুন। দিব্য অস্ত্র ও বিক্রম আপনাতেই বিদ্যমান